পূর্ব্ববঙ্গের রূপকথা

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

নব ভারতী
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১৩৬১

মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র

৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীঅ
শ্রীমদনমোহন বারিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও সর্ব্বস্বত্ব
৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪, শ
হইতে শ্রীমুরারিমোহন কুমার কর্ত্তৃক মু

সূচীপত্র

রমা

পূর্ব্ববঙ্গের রূপকথা

—:o:—

মহুয়া

ছ'মাসের হাঁটাপথ গারো পাহাড়। সেখান থেকে অনেক দূরে আরো উত্তরে হ'লো হিমালয়। আবার তারো উত্তরে বহু দূরে এক বন—যেমন নিবিড় তেমনি দুর্ভেদ্য। দিনে সূর্য্যের আলো সেখানে ঢোকে না, রাত্রে তারা দেখা যায় না।

তারই মধ্যে বাস কর্‌তো এক বেদে—নাম তার হুম্‌ড়ো সর্দ্দার। দিনের বেলায় সে দলবল নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। আর রাত্রে চুপিচুপি কর্‌তো ডাকাতি—সে আর তার ভাই মাণিক।

একদিন তারা দুই ভাই ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সন্ধ্যার সময় এসে পৌছলো এক গ্রামে।

সমস্ত দিন তাদের খাওয়া হয়নি! ক্ষিদেয় তেষ্টায় কাতর হ'য়ে খুঁজে খুঁজে তারা এক ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে উঠলো।

ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র কিন্তু অতিথি নারায়ণ! তাই ঘরে যা খুদকুঁড়ো ছিল নিজে না খেয়ে তাদের খাওয়ালেন। আর রাত্রে

শোবার জন্য তাদের ঘর ছেড়ে দিয়ে নিজে শুয়ে রইলেন বাইরের দাওয়ায় !

ব্রাহ্মণের কোলের কাছে তাঁর একমাত্র শিশুকন্যা নির্ভয়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। ছ'মাসের শিশু যেন ফুটন্ত গোলাপ !

মেয়েটির রূপ দেখে তাদের এমন লোভ হ'লো যে গভীর রাত্রে তারা দুই ভাই চুপিচুপি তাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেল একেবারে সেই দেশ ছেড়ে।

সকালে উঠে ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখতে না পেয়ে কেঁদেকেটে অস্থির হ'লেন এবং পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে লাগলেন চারিদিকে। কিন্তু হায়, তারা তখন চলে গেছে তাঁর সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে !

হুম্‌ড়ো আর মাণিক কোথাও না থেমে একেবারে সোজা গিয়ে ঢুক্‌লো তাদের বাসায়—সেই জঙ্গলের মধ্যে। আর পাখীকে যেমন ক'রে খাঁচায় পুরে রাখে তেমনি ক'রে মানুষ কর্‌তে লাগল মেয়েটিকে।

তাদের সেবায় যত্নে মেয়েটি বড় হ'তে লাগল। ছ'মাস থেকে এক বছর—এক বছর থেকে দু'বছর—দু'বছর থেকে দশ বছর—এমনি ক'রে একদিন সে ষোল বছরে পূর্ণ হ'লো !

হুম্‌ড়ো সর্দ্দার তাকে খেলা শেখালে, ভোজবাজী শেখালে। আর নিজের দলের সঙ্গে তাকে নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু মেয়েটির এমন রূপ যে, যে দেখে সেই চেয়ে থাকে তার পানে।

চাঁদের মত মুখ, পদ্মফুলের পাপড়ির মত চোখ, কালো-মেঘের মত পিঠ-ভরা চুল, আর কণ্ঠস্বর এত মিষ্টি যে কথা কইলে মনে হয় যেন ভ্রমর গুঞ্জন করছে। বেদের ঘরে এমন সোনার চাঁদ মেয়ে কোথা থেকে এলো, সবাই ভাবে!

অনেক ভেবেচিন্তে হুম্‌ড়ো তার নাম রাখলে মহুয়াসুন্দরী। অন্ধকারে মাণিকের মত জ্বলে তার রূপ!

কিছুদিন বাড়ীতে বসে থাক্‌বার পর হঠাৎ একদিন হুম্‌ড়ো তার ভাইকে ডেকে বল্‌লে, "মান্‌কে, চল্ আমরা খেলা দেখাতে বিদেশে যাই।"

মাণিক বল্‌লে, "চলো, অনেক দিন রোজগারপাতি হয়নি!"

পরদিন ভোরে উঠেই তারা রওনা হ'লো বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে।

আগে চল্‌লো হুম্‌ড়ো সর্দ্দার, তার পেছনে মহুয়াসুন্দরী, তার পেছনে মাণিক ভাই; আর তার পেছনে দলে দলে লোকজন! কারুর কাছে তাঁবু, কারুর কাছে বাঁশ, কারুর কাছে দড়িদড়া; কেউ নিলে তোতাপাখী, কেউ নিলে ময়না, কেউ নিলে সোনা-মুখী দোয়েল, কেউ নিলে গাধা-ঘোড়া, আবার কেউ বা নিলে চণ্ডালের হাড়! এইভাবে তারা এক-একজন এক-একটা জিনিষ নিয়ে সারি দিয়ে চল্‌লো।

কত মাঠঘাট, কত নদনদী, কত অরণ্যপ্রান্তর পেরিয়ে শেষে তারা গিয়ে হাজির হ'লো এক গ্রামে। তার নাম বামুনকাঁদা।

সেখানকার জমিদার হ'লেন নদেরচাঁদ ঠাকুর। তিনি তখন পাত্রমিত্র নিয়ে সভায় বসেছিলেন। একজন লোক ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁকে খবর দিলে, একদল বেদে খেলা দেখাবার জন্য গ্রামে এসেছে।

নদেরচাঁদের বয়স খুব বেশী নয়—উনিশ কি কুড়ি। বেদের খেলা দেখতে তিনি খুব ভালবাসেন। তাই তৎক্ষণাৎ সভা ছেড়ে ভিতরে অন্তঃপুরে গেলেন মায়ের কাছে অনুমতি নিতে।

ছেলের এই আব্দার মা ঠেল্তে পার্লেন না। বল্লেন, "কত টাকা লাগবে ?"

নদেরচাঁদ বল্লেন, "একশো টাকা।"

মা বল্লেন, "আচ্ছা, তাদের খবর দাও—তারা বাড়ীর ভিতরে এসে খেলা দেখাক্।"

হুম্ড়োর কাছে খবর গেল। সে তখনি তার দলবল নিয়ে জমিদার-বাড়ীতে এসে হাজির হ'লো এবং ঢোল বাজিয়ে, কাঁসি বাজিয়ে খেলা সুরু ক'রে দিলে।

ঢোলের শব্দ শুনে গ্রামের লোকেরা ছুটোছুটি কর্তে লাগল। এ ডাকে ওকে—ও ডাকে তাকে। এইভাবে একজনের মুখ থেকে আর একজন—এই রকম ক'রে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো সারা গ্রামে। দেখতে দেখতে রীতিমত একটা ভীড় জমে গেল জমিদার-বাড়ীতে।

প্রথমে উঠলো হুম্ড়ো সর্দ্দার খেলা দেখাতে। তারপর মাণিকভাই, তারপর অন্যান্য খেলোয়াড়রা। ঘোড়া, কুকুর, ময়না,

তোতাপাখী প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ার নিয়ে কত রকমের খেলা তারা দেখালে। সবাই অবাক্ হ'য়ে দেখতে লাগল তাদের কসরৎ!

এমন সময় উঠলো বেদের মেয়ে মহুয়াসুন্দরী!

নদেরচাঁদ বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন তাকে দেখে। তারপর যেই সে দড়ি বেয়ে একটা বাঁশের ওপর উঠলো খেলা দেখাতে, নদেরচাঁদ এমনি ব'লে উঠলেন, "দেখো, দেখো, যেন পড়ে যায় না।" তাঁর বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ কর্‌তে লাগল!

করতালের রুনুঝুনু, ঢোলকাঁসির মৃদুমন্দ বাদ্যের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে মহুয়া গান গাইতে লাগল এবং শেষে হাতপেতে সবার কাছে বক্‌শিস্ চাইতে চাইতে হঠাৎ নদেরচাঁদের সাম্‌নে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো! তারপর ঈষৎ হেসে গানের সুরে বক্‌শিস্ চাইলে তাঁর কাছে।

হাজার টাকা মূল্যের শাল ছিল নদেরচাঁদের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানা গা থেকে খুলে মহুয়াসুন্দরীর হাতে দিলেন। নাচতে নাচতে সেলাম ক'রে সে চলে গেল।

তখন সর্দ্দার উঠে নদেরচাঁদ ঠাকুরের কাছে বাস কর্‌বার জন্য একখানা নতুন বাড়ী বক্‌শিস্ চাইলে।

নদেরচাঁদ ঠাকুর তৎক্ষণাৎ একখানা বাড়ী ও অনেক জমিজমা তাকে দান কর্‌লেন।

এত বক্‌শিস্ পেয়ে তাদের আর আনন্দ ধরে না। তারা শতমুখে নদেরচাঁদ ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই নতুন বাড়ীতে গিয়ে ঢুক্‌লো এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস কর্‌তে লাগলো।

কিন্তু মুস্কিল হ'লো মহুয়াকে নিয়ে। নতুন ঘর, নতুন বাড়ী, নতুন ক্ষেতখামার পেয়েও তার মনে সুখ নেই। কি হ'লো কে জানে! দিনরাত সে শুধু কাঁদ্‌তে লাগলো।

হুম্‌ড়ো সর্দ্দার তাকে কত বোঝায়, কত কি দেবো বলে কিন্তু কিছুতেই তার কান্না থামে না।

তখন হুম্‌ড়ো একটা মতলব ঠাওরালে। সেই গ্রামে মহুয়ার এক সই ছিল—তাকে ডেকে চুপিচুপি সে বল্‌লে, মহুয়ার মনে কি হ'য়েছে সঠিক ব'লে দিতে হবে।

মেয়েরা মেয়েদের মনের কথা সহজেই বুঝতে পারে। তাই দু'দিন পরে সে হুম্‌ড়োকে গিয়ে খবর দিলে, মহুয়া নদেরচাঁদকে বিয়ে কর্‌তে চায়—তাই কাঁদে!

এই কথা শুনে হুম্‌ড়ো সর্দ্দারের মুখ শুকিয়ে গেল। নদেরচাঁদ ঠাকুর প্রবলপ্রতাপ জমিদার! তাঁর অর্থবল আছে—লোকজনের অভাব নেই—মনে কর্‌লেই মহুয়াকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর্‌তে পারে!

হুম্‌ড়ো রীতিমত ভয় পেয়ে গেল! এবং সেখানে থাকা আর উচিত নয় এই মনে করে, সেইদিন-ই গভীর রাত্রে লোকজন নিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে গেল সেই গ্রাম ছেড়ে।

জমিজায়গা, ক্ষেতখামার, বাড়ীঘর—সব পড়ে রইল—একবারও তাদের দিকে ফিরে চাইলে না।

এদিকে সকাল হ'তেই লোকজনেরা গিয়ে নদেরচাঁদ ঠাকুরকে খবর দিলে যে হুম্‌ড়ো তার দলবল নিয়ে পালিয়েছে।

কেন পালালো ! কেনই বা তাঁকে না-ব'লে গেল ! নদের-চাঁদ কিছুই ভেবে পেলেন না। তখন তিনি দু'চারজন চর লাগিয়ে দিলেন তাদের পালিয়ে যাবার কারণ অনুসন্ধান কর্‌বার জন্য।

চরেরা মহুয়ার সইয়ের কাছ থেকে সব কথা বের ক'রে নিলে। তারা এসে নদেরচাঁদকে বল্‌লে, "মহারাজ, পাছে আপনি মহুয়াসুন্দরীকে বিয়ে করেন, এই ভয়ে হুম্‌ড়ো সর্দ্দার আপনাকে না-ব'লে পালিয়েছে—মহুয়া নাকি আপনাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য কান্নাকাটি সুরু করেছিল।"

রাগে নদেরচাঁদের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। তিনি ভাবলেন, এতবড় স্পর্দ্ধা হুম্‌ড়ো সর্দ্দারের যে আমাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিল ব'লে মেয়েকে নিয়ে পালাল ! কেন, আমি কি তার জামাই হবার অযোগ্য ? জমিদার নদেরচাঁদ কি একটা বেদের মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে পারে না ? আচ্ছা, দেখে নেবো সে কেমন ক'রে আমায় বাধা দেয় ! এই ব'লে পরদিন ভোর হ'তে না হ'তেই নদেরচাঁদ বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন মহুয়াসুন্দরীর সন্ধানে।

এ-দেশ, ও-দেশ, সে-দেশ ক'রে তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখনো উত্তরে যান, কখনো পশ্চিমে যান, আবার কখনো বা যান দক্ষিণে। কিন্তু বৃথা—কোথাও তিনি তাদের সন্ধান কর্‌তে পারেন না।

পথেঘাটে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদেরই জিজ্ঞাসা করেন—তারা কেউ বল্‌তে পারে না। তখন মহুয়াকে কেমন দেখতে,

হুম্‌ড়ো সর্দ্দারকে কেমন দেখতে বর্ণনা করেন, কিন্তু তবুও কোন ফল হয় না। হয়রান হ'য়ে তিনি ঘুরে বেড়ান দেশ-বিদেশে।

এইভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ছ'মাস কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন নদেরচাঁদ গিয়ে হাজির হ'লেন একেবারে মহুয়াদের বাড়ী।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বাড়ীতে হুম্‌ড়ো সর্দ্দার ছিল না।

নদেরচাঁদকে দেখেই মহুয়া চিন্‌তে পার্‌লে। কিন্তু অন্যের কাছে তাঁর পরিচয় গোপন ক'রে বল্‌লে, নতুন অতিথি।

তখনই অতিথি-সৎকারের ধুম পড়ে গেল।

মহুয়াসুন্দরী রান্নাবান্নার উদ্যোগ-আয়োজন কর্‌তে লাগল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানাবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন পাক ক'রে একেবারে ঘর ভরিয়ে ফেললে।

ইতিমধ্যে হুম্‌ড়ো সর্দ্দার বাসায় ফিরে এলো। কিন্তু মহুয়ার কাজে আজ হঠাৎ এত উৎসাহ দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হ'লো। ছ'মাস ধরে যে-মেয়ে অন্যমনস্ক ও মন-মরা হ'য়েছিল তার অকস্মাৎ এই কর্ম্মপ্রেরণা কোথা থেকে এলো! এই কথা মনে মনে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে হুম্‌ড়ো দেখতে গেল নতুন অতিথিটিকে। কিন্তু একি—এ যে সেই জমিদার নদেরচাঁদ ঠাকুর! হুম্‌ড়ো শিউরে উঠলো।

কিন্তু মুখে কোন কথা না ব'লে সাদরে নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা কর্‌লে।

খাওয়া-দাওয়া ক'রে নদেরচাঁদ চলে গেলেন এবং খানিক দূরে গিয়ে নদীর ধারে একটা গাছের তলায় শুয়ে রইলেন।

দুশ্চিন্তায় আবার হুম্‌ড়োর মুখ শুকিয়ে গেল। যার ভয়ে সব ছেড়ে দিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে সে, সেই আপদ আবার কোথা থেকে এসে জুট্‌লো!

গভীর রাত। সবাই তখন অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। এমন সময় একখানা ধারালো ছোরা হাতে ক'রে পা টিপে টিপে হুম্‌ড়ো সর্দ্দার মহুয়ার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো। তারপর চাপা-গলায় তাকে ডাকলে।

হঠাৎ চোখ খুলেই মহুয়া দেখলে তার সামনে একখানা ছোরা চক্‌চক্ কর্‌ছে।

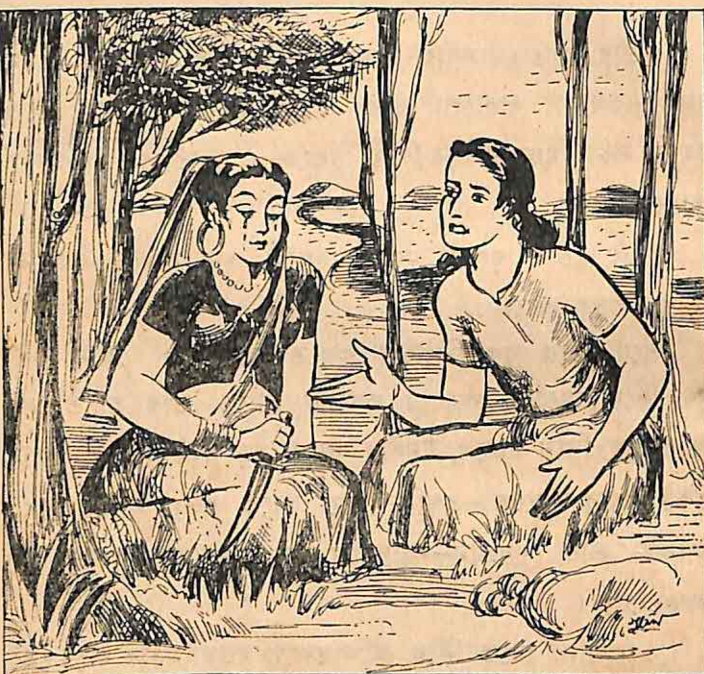
ভয়ে তার বুক ঢিপঢিপ কর্‌তে লাগলো। কোন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ কর্‌বার আগেই হুম্‌ড়ো তার হাতে সেই ছোরাখানা দিয়ে বল্‌লে, "নদীর ধারে বড় ঝাউগাছটার তলায় একটা লোক ঘুমুচ্ছে—এখুনি গিয়ে তাকে হত্যা কর্‌তে হবে। লোকটা ভারী শয়তান—যাদুমন্ত্রে সে আমাদের সকলকে বশ কর্‌তে চায়।

ছোরাখানা হাতে নিয়ে কম্পিতবক্ষে মহুয়া নদীর ধারে সেই ঝাউতলায় গেল। তারপর সেই নিদ্রিত লোকটির বুকে ছোরা বসাতে গিয়ে চম্‌কে উঠলো সে।

এ-যে নদেরচাঁদ!

কি ক'রে তার বুকে ছুরি মার্‌বে! এই ভেবে মহুয়া সেখানে বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগলো।

তার কান্নার শব্দ পেয়ে নদেরচাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন, "তুমি কাঁদছ কেন— আর তোমার হাতে ছোরা কেন?"



মহুয়া তখন পিতার নিষ্ঠুর আদেশের কথা তাঁকে বল্‌লে।

সেই কথা শুনে নদেরচাঁদ একটুখানি চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, "তার জন্যে কান্নার কি আছে! আমি বুক পেতে দিচ্ছি, তুমি আমায় হত্যা ক'রে তোমার পিতার আদেশ পালন কর।"

মহুয়া বল্‌লে, "তা আমি কিছুতেই পার্‌বো না। তার চেয়ে এই ছোরাখানা তুমি আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে আমায় এই পাপ কাজ থেকে মুক্তি দাও।"

নদেরচাঁদ বল্‌লেন, "অসম্ভব।"

দু'জনের কেউ-ই যখন সে কাজ কর্‌তে রাজী হ'লো না, তখন নদেরচাঁদ বল্‌লেন, "তার চেয়ে একটা কাজ কর্‌লে এখুনি এ সমস্যার সমাধান হয়।"

মহুয়া বল্‌লে, "কি কাজ?"

নদেরচাঁদ বল্‌লেন, "চলো আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। তারপর আমার দেশে গিয়ে বিয়ে ক'রে আমরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস কর্‌বো।"

বিয়ের কথা শুনে মহুয়ার মনে সাহস হ'লো। একটু ভেবে সে বল্‌লো—"কিন্তু হুম্‌ড়ো সর্দ্দার একথা জান্‌তে পার্‌লে আর আমার রক্ষা থাক্‌বে না।"

নদেরচাঁদ বল্‌লেন, "সর্দ্দার জান্‌তে পার্‌বার আগেই আমরা এদেশ ছেড়ে অন্যদেশে চলে যাবো।"

মহুয়া রাজী হ'লো।

তখন দু'জনে সেই অন্ধকারে মাঠ, ঘাট, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুট্‌তে লাগলো।

ভোর হবার আগেই তারা এসে পৌঁছল একটা নদীর ধারে। কিন্তু কি ক'রে পার হবে! তারা তখন পড়লো মহা দুশ্চিন্তায়।

এমন সময় তারা দেখলে দূরে একটা নৌকোর আলো দেখা যাচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি কর্‌বার পর নৌকোটি পারে এসে ভিড়লো এবং তাদের পার ক'রে দিতে রাজী হ'লো।

নৌকোটি এক মহাজনের। সে লোকজন নিয়ে দূরে কোন হাটে মাল কিন্‌তে যাচ্ছিল। তাই নিঃসন্দেহে তারা তাতে উঠলো।

কিন্তু বিপদ হ'লো ভারী! নৌকো যেই মাঝনদীতে গিয়েছে অমনি কয়েকজন ষণ্ডা ষণ্ডা লোক এসে নদেরচাঁদকে ঘিরে দাঁড়ালো এবং দড়ি দিয়ে তার হাত-পা বেশ ক'রে বেঁধে তাকে নদীর জলে ফেলে দিলে।

মহুয়া চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। কিন্তু কে তার কান্না শোনে?

সেই নৌকোর মহাজনটি তখন মহুয়াকে গিয়ে বল্‌লে, "আমি তোমায় বিয়ে কর্‌বো ব'লে দেশে নিয়ে যাচ্ছি—তোমার কি কোন আপত্তি আছে?"

মহুয়া তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে, সেই দলের সর্দ্দার এবং তার কাছে কান্নাকাটি বৃথা। তাই ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "না, কোন আপত্তি নেই।" কিন্তু মনে মনে সে চিন্তা কর্‌তে লাগলো কেমন ক'রে এই দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

এদিকে মহুয়ার কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে মহাজনটির আর স্ফূর্ত্তি ধরে না।

মহুয়াকে গিয়ে সে বল্‌লে, "আজ ভারী আনন্দের দিন—তুমি নিজ হাতে পান সেজে আমাদের সকলকে খাওয়াও।"

পানের কথা বল্‌তেই চট্ ক'রে মহুয়ার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। তার চুলের মধ্যে তক্ষকের বিষ লুকানো ছিল। সে কর্‌লে কি চূণের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে পান সাজলে এবং তাদের প্রত্যেককে নিজে হাতে ক'রে এক-একটা খেতে দিলে।

মাঝিমাল্লা, লোকজন নৌকোয় যে যেখানে ছিল সবাই সেই পান খেয়ে ঢলে পড়লো এবং দেখতে দেখতে মুখ দিয়ে গেঁজো উঠে সবাই মরে গেল।

তখন মহুয়া সেই মৃতদেহগুলোকে একে একে নদীর মধ্যে ফেলে দিয়ে নিজে নৌকো বাইতে বাইতে পারে গিয়ে হাজির হ'লো।

ওপরে উঠে মহুয়া দেখলে চারিদিকে শুধু বিজন বন। কোথাও কোন পথঘাট বা লোকালয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। তখন সে একাকিনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যদি কোন আশ্রয় মেলে এই আশায়!

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তার দেহ অবশ হ'য়ে পড়লো। পা আর চলে না। কোন্ দিকে যাবে? যেদিকে যায়—সেদিকেই ঘন দুর্ভেদ্য বন!

এইভাবে সমস্ত দিনটা যা'হোক ক'রে কাট্‌লো। কিন্তু সূর্য্য অস্ত যেতেই মহুয়ার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। এখুনি অন্ধকার এসে সমস্ত বনভূমি আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌বে—তখন সে কি কর্‌বে!

একটা আশ্রয়ের জন্য মহুয়া ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু কোথায় আশ্রয় ? পাগলের মত সে গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যের মধ্যে ঢুক্‌তে লাগলো। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আস্‌ছে অরণ্যের অভ্যন্তরে, বৃক্ষলতার ফাঁকে ফাঁকে।

মহুয়ার বুক ঢিপঢিপ কর্‌তে লাগলো। সে আরো দ্রুত ঢুক্‌তে লাগল অরণ্যের মধ্যে। এমন সময় যেন ভগবান তার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন।

সেই বনের মধ্যে সে একটা ভাঙ্গা মন্দির দেখতে পেলে।

তাড়াতাড়ি সেই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে মহুয়া দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর ক্লান্ত হ'য়ে সে সেখানে শুয়ে পড়লো। কিন্তু পা ছড়াতেই সে চম্‌কে উঠলো ! কি যেন একটা জিনিষ তার পায়ে ঠেক্‌লো—উঠে বসে যা দেখলে তাতে তার দেহ হিম হ'য়ে গেল !

পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ—এবং সেটা নদেরচাঁদের !

মহুয়া ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো এবং পাগলিনীর মত ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে আপনা আপনি তার কান্না থেমে গেল। সে ভাবতে লাগল কেমন ক'রে মৃতদেহটা এখানে এলো—কে আন্‌লে তাকে ?

এমন সময় ঠক্ ঠক্ ক'রে দরজায় শব্দ হ'লো।

মহুয়া চম্‌কে উঠলো। আতঙ্কে তার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো !

বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে কে বল্‌লে, "দরজা খোল—কোন ভয় নেই।"

কম্পিতপদে ও শঙ্কিতবক্ষে মহুয়া গিয়ে দরজা খুলে দিলে। সাম্‌নে এক জটাজুটলম্বী দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসীকে দেখে ভয়ে



সে আড়ষ্ট হ'য়ে রইল—তার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "কে তুই ?"

ছিন্নলতার মত তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে মহুয়া কাঁদ্‌তে লাগল এবং একে একে সব কথা তাঁকে খুলে বল্‌লে।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "কোন ভয় নেই—তোমার স্বামীকে আমিই জল থেকে তুলে এনে এখানে রেখেছি। সে এখনো মরেনি—অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে আছে!"

"মরেনি! তবে কি আবার বাঁচতে পারে?" মহুয়া কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে প্রশ্ন কর্‌লে।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "পারে। কিন্তু তাকে বাঁচালে তুমি আমায় কি পুরস্কার দেবে?"

মহুয়া বল্‌লে, "আমার স্বামীর জীবন পেলে আপনি যা চাইবেন তাই দেবো!"

সন্ন্যাসী তখন বন থেকে একটা গাছের পাতা তুলে এনে মহুয়ার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "যাও, নদী থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে এই পাতায় ক'রে জল নিয়ে এসো।"

মহুয়া তৎক্ষণাৎ পাতায় ক'রে জল নিয়ে এলো। সন্ন্যাসী কি মন্ত্র পড়ে তাকে সেই জলটা নদেরচাঁদের মুখে ঢেলে দিতে বল্‌লেন।

মহুয়া তাড়াতাড়ি নদেরচাঁদের মুখটা ফাঁক ক'রে জল ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নদেরচাঁদ চোখ মেলে চাইল। আনন্দে মহুয়ার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। গভীর শ্রদ্ধাভরে সে সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে।

সন্ন্যাসী কোন কথা না ব'লে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

এইভাবে আরো তিন-চার দিন কেটে গেল। মহুয়ার সেবায় ক্রমশঃই নদেরচাঁদ সুস্থ হ'য়ে উঠতে লাগলো।

হঠাৎ আবার একদিন ভোরে সন্ন্যাসী সেখানে এসে হাজির হ'লেন।

মহুয়া ছুটে গিয়ে তাঁকে নমস্কার কর্‌লে। তখন সন্ন্যাসী মহুয়াকে বল্‌লেন তাঁর সঙ্গে আস্‌তে।

মহুয়া কোন কথা না ব'লে তাঁর পিছু পিছু চল্‌তে লাগলো। ক্রমশঃ গভীর থেকে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে তারা ঢুক্‌তে লাগলো। শেষে এক জায়গায় হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "মনে আছে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে আমি যা চাইবো তাই দেবে!"

—"হ্যাঁ আছে এবং চিরদিন থাক্‌বে। আদেশ করুন কি কর্‌তে হবে।"

তখন সন্ন্যাসী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, "তোমার রূপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি—আমি তোমায় বিয়ে কর্‌তে চাই!"

তাড়াতাড়ি মহুয়া দুই কানে হাতচাপা দিয়ে বল্‌লে, "ছিঃ ছিঃ, ও-কথা শুন্‌লে যে পাপ হয়—স্ত্রীলোকের এক স্বামী থাক্‌তে ত অন্য বিবাহ হয় না। আপনি এ ছাড়া অন্য কিছু আমায় আদেশ করুন।"

রাগে সন্ন্যাসীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। দৃঢ় অথচ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন, "মাত্র দু'দিন সময় দিলুম—এর মধ্যে

ভেবে আমার কথার উত্তর দেওয়া চাই। এ ছাড়া অন্য কিছু আমি তোমার কাছ থেকে চাই না।”

চিন্তিতমুখে মহুয়া ফিরে এলো মন্দিরে। সমস্ত দিন ধ'রে সে ভাবতে লাগল কি ক'রে রক্ষা পাওয়া যায় এই সন্ন্যাসীর হাত থেকে।

শেষে তার মাথায় একটা মতলব এল। সেইদিন গভীর রাত্রে সে নদেরচাঁদের রুগ্ন দেহটাকে কাঁধে ফেলে চুপিচুপি পালিয়ে গেল সেই বন ছেড়ে।

ছ'পা ক'রে যায়, আবার পিছন ফিরে তাকায়—এইভাবে মহুয়া চল্‌তে লাগল ভয়ে ভয়ে। কি জানি যদি সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোথাও দেখা হ'য়ে যায়!

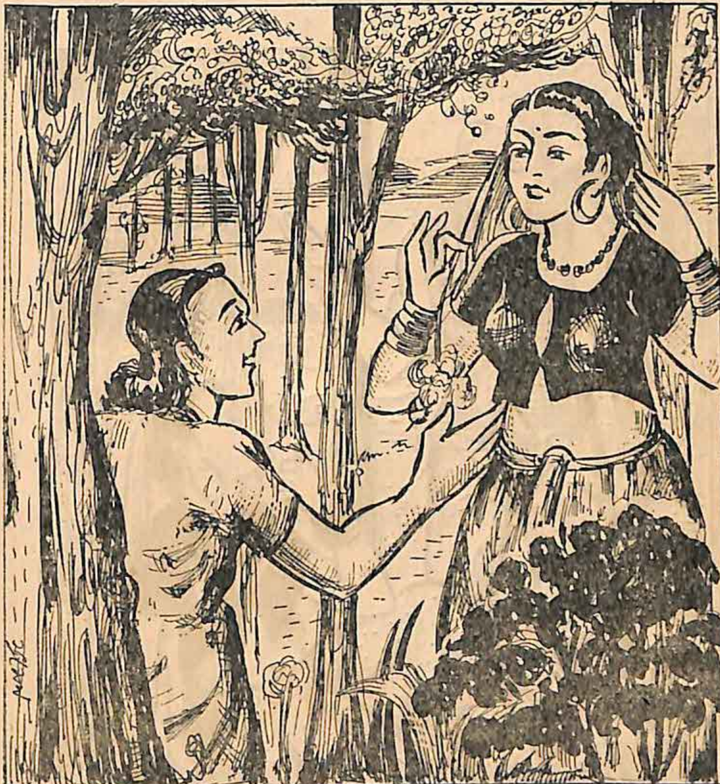
অনাহারে, অনিদ্রায়, দশদিন ধ'রে ক্রমাগত চল্‌তে চল্‌তে শেষে তারা একটা খুব নির্জ্জন স্থানে এসে পেঁছিলো।

চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা অতি নির্জ্জন স্থানটি। প্রচুর ফল-ফুলের গাছ—তারই মধ্যে তারা লুকিয়ে রইলো।

দেখতে দেখতে গাছের ফল খেয়ে এবং বনের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে নদেরচাঁদের দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠলো। মহুয়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, গাছে গাছে ওঠানামা করে, ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে তারা ছ'জনে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল সেই বনের মধ্যে।

এইভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

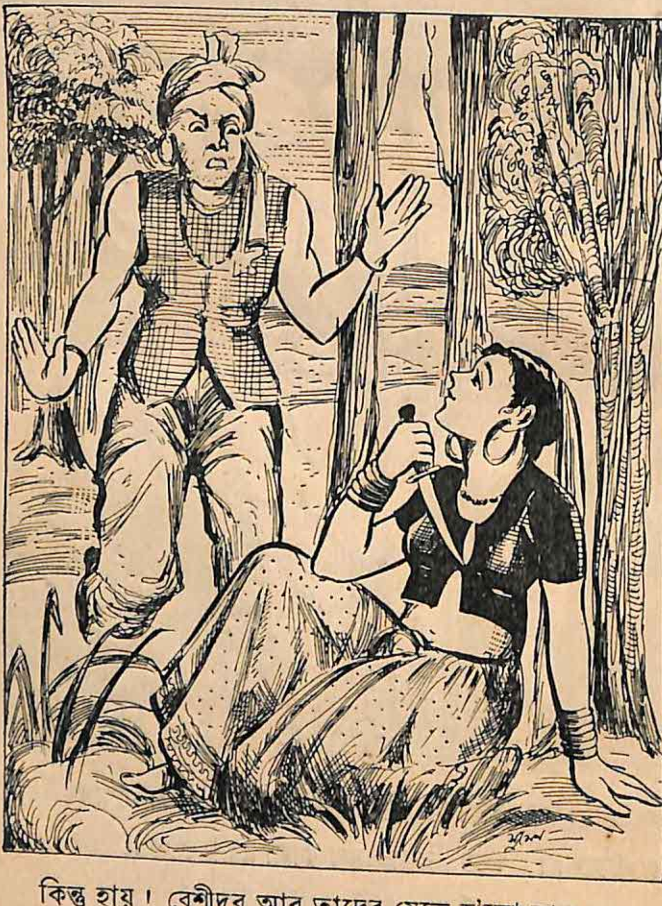
এইবার নদেরচাঁদ মহুয়াকে নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন স্থির কর্‌লেন।



এমন সময় একদিন সেই বনে হঠাৎ একটা বেদের বাঁশী বেজে উঠলো। ভয়ে মহুয়ার মুখ কালী হ'য়ে গেল।

এ যে হুমড়ো সর্দ্দারের বাঁশী!

ছুটে গিয়ে সে নদেরচাঁদকে বল্‌লে। তৎক্ষণাৎ তারা দু'জনে পালিয়ে গেল সেই স্থান ছেড়ে। মহুয়া আর নদেরচাঁদ লুকিয়ে লুকিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে লাগলো।



কিন্তু হায়! বেশীদূর আর তাদের যেতে হ'লো না।

হুম্‌ড়ো সর্দ্দার তার দলবল নিয়ে সেখানে লুকিয়েছিল। চারিদিক থেকে তারা একেবারে ঘিরে ফেল্‌লে তাদের দু'জনকে।

মহুয়া মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

একখানা বিষ-মাখানো ছোরা হাতে ক'রে হুম্‌ড়ো সর্দ্দার এগিয়ে এলো এবং মহুয়ার হাতে সেখানা গুঁজে দিয়ে বল্‌লে, "এখনো সময় আছে—যদি ভাল চাস্‌ ত এই ছোরাখানা নদেরচাঁদের বুকে বসিয়ে দে। আমি সুজনের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো—কোন চিন্তা নেই। সুজন আমার শিষ্য—আমার স্বজাতি ও স্বগোত্র।"

মহুয়া কোন কথা না ব'লে ছোরাখানা হুম্‌ড়োর হাত থেকে নিলে এবং চক্ষের নিমেষে নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে,—"মহুয়া একজন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পুরুষকে স্বামী বল্‌তে পারবে না—তার চেয়ে মৃত্যু তার শ্রেয়ঃ।"

সঙ্গে সঙ্গে মহুয়ার কথা এড়িয়ে এলো এবং তার সারা দেহ কঠিন ও হিম হ'য়ে গেল।

তখন হুম্‌ড়ো সর্দ্দারের সমস্ত রোষ গিয়ে পড়লো নদেরচাঁদের ওপর।

তারা সকলে মিলে তখন নদেরচাঁদকে ঘিরে সেইখানে ঠেঙিয়ে মেরে ফেল্‌লে।

কাজলরেখা

ভাটিয়ালগ্রামে ছিল এক সদাগর। সাধু ধনেশ্বর তার নাম। ডিঙি ভ'রে জিনিসপত্তর নিয়ে সে ব্যবসা কর্‌তে যেতো দেশ-দেশান্তরে। মা-লক্ষ্মী তার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন। দেখতে দেখতে তার ঘর ভ'রে উঠলো ধনদৌলতে। চক্‌মিলানো বাড়ী, হাতী, ঘোড়া, লোকজন, হীরেমুক্তো, সোনারূপো কত যে হ'লো তার হিসাব নিকাশ নেই।

এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সদাগর মনের সুখে থাকে।

মেয়েটি বড়—নাম তার কাজলরেখা। ফুটন্ত পদ্মফুলের মত তাকে দেখতে। যে দেখে সেই 'হাঁ' ক'রে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে। রূপ যেন উথলে পড়ছে তার দেহ থেকে।

ছেলেটির বয়স চার বছর—নাম রত্নেশ্বর। সোনার মত তার দেহের রঙ—চাঁদের মত তার মুখ।

মা-লক্ষ্মীর কৃপায় ধনেশ্বরের কোন অভাব নেই—কোন দুঃখ নেই। ধূলিমুঠি ধর্‌লে, কড়িমুঠি হ'য়ে যায়। যেদিকে তাকায় সেদিক-ই পূর্ণ—ধনদৌলতে।

কিন্তু যাঁর কৃপায় এত ঐশ্বর্য্য, এত সুখ তাকে ভুলে গেল সদাগর একেবারে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমোদ-উৎসবে মত্ত হ'লো। কুসংসর্গে পড়ে নেশা, ভাঙ, জুয়া প্রভৃতি অনেক রকম বদ অভ্যাস ধর্‌লে।

ব্যবসা-বাণিজ্য চুলোয় গেল। সেদিকে আর ভুলেও সে দৃষ্টিপাত করে না। অনাচার যেখানে মা-লক্ষ্মী সেখানে থাকতে পারেন না। তাই একদিন রাগ ক'রে তিনি সদাগরকে ছেড়ে চলে গেলেন।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে সদাগর একেবারে সব হারিয়ে পথের ভিখিরী হ'য়ে গেল।

হাতীঘোড়া, লোকজন, ধনদৌলত—সব যেন দেখতে দেখতে কর্পূরের মত কোথায় উবে গেল।

এদিকে কাজলরেখার বিয়ের সময় উপস্থিত হ'লো। কিন্তু বর আর মেলে না। জুয়াড়ীর মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে রাজী হয় না। সাধু ধনেশ্বর তখন মাথায় হাত দিয়ে পড়লো! মেয়ের এগারো বছর বয়স পূর্ণ হ'লো, কি হবে!

এমন সময় একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন সদাগরের বাড়ীতে। সদাগর কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

সন্ন্যাসী একটি শুকপাখী ও একটি বহুমূল্য পাথরের আংটি তার হাতে দিয়ে বল্লেন, "এই পাখীটি ধর্ম্মমতী শুক। তুমি যদি এর কথামত কাজ করো, তাহ'লে তোমার আর কোন অভাব থাকবে না। আবার সমস্ত হারানো সম্পত্তি ফিরে পাবে।"

সদাগর আনন্দে গদগদ হ'য়ে সন্ন্যাসীর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিলে।

সন্ন্যাসী তাকে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নিলেন।

একদিন সদাগর ধর্ম্মমতী শুককে বল্‌লে, "ওগো পাখী, আমায় ব'লে দাও, কি কর্‌লে আমার দুঃখ ঘুচবে? হাতীঘোড়া, অট্টালিকা, দাসদাসী, ধনদৌলত—একদিন আমার সব ছিল কিন্তু আজ ভাগ্যের দোষে সব হারিয়ে আমি পথের ভিখিরী হয়েছি। এক ছেলে, এক মেয়ে—তাও বাছাদের পেট ভ'রে খেতে দিতে পারি না।" এই কথা ব'লে সদাগর কাঁদ্‌তে লাগলো।

শুকপাখী বল্‌লে, "যা গিয়েছে তা গিয়েছে, তার জন্যে ঘরের কোণে ব'সে শুধু মেয়েদের মত কাঁদ্‌লে কি হবে! তুমি পুরুষ, তোমার দেহে বল আছে, এখনো খাটবার শক্তি রয়েছে। ওঠো, জাগো, আবার লেগে যাও বাণিজ্যে। যা হারিয়েছ আবার সব ফিরে আস্‌বে!"

সদাগর বল্‌লে, "কিন্তু কি নিয়ে বাণিজ্য কর্‌বো? আমার যে কিছু নেই।"

শুকপাখী বল্‌লে, "তোমার হাতে যে আংটি রয়েছে ওইটে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রী করো; তাহ'লেই অনেক টাকা পাবে। ওই টাকাতে তোমার ভাঙা নৌকো মেরামত ক'রে নিয়ে সোজা পূবদেশেতে চ'লে যাও। দেখবে সেখানে বাণিজ্য ক'রে এক বছরে যা রোজগার কর্‌বে বারো বছর ধ'রেও তা খেয়ে ফুরোতে পার্‌বে না।"

এই কথা শুনে ধনেশ্বরের বুকে যেন বল এলো। সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে চ'লে গেল শহরে। সেখানে আংটিটা

বিক্রী ক'রে অনেক টাকা পেলে। তারপর ভাঙা নৌকোটা মেরামত ক'রে নিয়ে চল্‌লো পূবদেশে।



এইভাবে বাণিজ্য ক'রে অল্পদিনের মধ্যেই সাধু ধনেশ্বর আবার প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করলে।

দেখতে দেখতে আবার ধনদৌলত উপ্‌চে পড়লো তার ঘরে। হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, বাড়ীঘর আবার তার সব হ'লো। আবার সুখ, আবার শান্তি, আবার লক্ষ্মী এলো ঘরে!

অভাব ঘুচলো। এইবার সদাগরের মনে জাগল কাজলরেখার বিয়ের চিন্তা।

তখন আবার একদিন ধনেশ্বর শুকপাখীকে জিজ্ঞাসা করলে, "ওগো পাখী, বলো আমার মেয়ের কবে বিয়ে হবে? সে যে এগারো পেরিয়ে বারোয় পড়লো। অথচ বিয়ের কোন কিছুই এখনো স্থির হ'লো না।"

শুকপাখী বল্লে, "সদাগর, তোমার সব দুঃখ দূর হ'য়েছে কিন্তু এ দুঃখ দূর হ'তে এখনো অনেক দেরী। কাজলরেখার বিয়ে হবে এক মরা স্বামীর সঙ্গে, তাই তাকে আর ঘরে না রেখে এখুনি বনবাস দিয়ে এসো।"

এই নিষ্ঠুর কথা শুনে সদাগর ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। 'একমাত্র মেয়ে, এমন সোনার প্রতিমা—তাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। বাপ হ'য়ে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে মরা স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবো!' এই ব'লে সে অনুশোচনা করতে লাগলো।

শুকপাখীর কথা মিথ্যা হবার নয়। তাই ঘাটে ডিঙি সাজিয়ে একদিন সদাগর কাজলরেখাকে বল্লে, "চলো মা, আজ আমরা বাপ-বেটীতে বাণিজ্য করতে যাই।"

কাজলরেখা এর আগে বহুবার পিতার সঙ্গে বহুস্থানে গিয়েছিল। তাই সরলমনে সেজেগুজে সে বাপের সঙ্গে রওনা হ'লো।

পালে হাওয়া লেগে ডিঙি ছুটলো শন্ শন্ ক'রে। বহুদূর যাবার পর নৌকোটা গিয়ে ভিড়লো একটা জঙ্গলের ধারে।

ধনেশ্বর কন্যাকে নিয়ে সেই জঙ্গলের ধারে ঢুক্‌লো। পথ আর ফুরোয় না—চলেছে ত চলেছে। আগে বাপ আর পেছনে মেয়ে।

গভীর অরণ্য! কোথাও কোন লোকজনের চিহ্ন নেই—এমন কি পশুপক্ষীর ডাক পর্য্যন্ত শোনা যায় না। কাজলরেখার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো! এ কোথায় তার বাবা তাকে নিয়ে যাচ্ছে! ভয়ে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে সে বল্‌লে, "বাবা, আমরা কোথায় যাচ্ছি? এই বনের মধ্যে তুমি কি বাণিজ্য কর্‌বে বাবা?"

সদাগর কন্যার কথার কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে শুধু বার তুই ঢোক গিল্‌লে। তার কণ্ঠ শুষ্ক হ'য়ে এসেছিল, চোখে জল ছলছল কর্‌ছিল।

কাজলরেখা বল্‌লে, "বাবা, চলে চলো এখান থেকে—আমার বড় ভয় কর্‌ছে!"

মায়ের কথা, ভাইয়ের কথা, বাড়ীর কথা মনে প'ড়ে তার চোখে জল এসে পড়লো।

ধনেশ্বর বল্‌লে, "এই যে মা, এসে পড়েছি—আর বেশী দূর নেই।"

কিছুদূর গিয়েই তারা দেখতে পেলে সাম্‌নে একটা ভাঙা মন্দির—তার কবাট বন্ধ ভিতর থেকে। মন্দিরের সিঁড়িতে তখন তারা তু'জনেই ব'সে পড়লো।

গ্রীষ্মকাল—তায় ঠিক তুপুর। আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। তৃষ্ণায় কাজলের বুকের ছাতি ফেটে যেতে লাগলো।

ছেলেমানুষ—এতটা পথ হেঁটে এসেছে, তার ওপর ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। এদিক-ওদিক চেয়ে কোথাও জল দেখতে না পেয়ে সে বল্‌লে, "বাবা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—একটু জল খাবো।"

মেয়েকে সেখানে বসিয়ে রেখে সদাগর জলের অন্বেষণে বনের মধ্যে ঢুক্‌লো।

কোথায় জল, কিছুই তার জানা নেই—তাই হাতড়াতে হাতড়াতে এদিক-ওদিক ঘুর্‌তে লাগলো।

বাপের ফির্‌তে দেরী হচ্ছে দেখে কাজলরেখা সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরের ওপর উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো।

ভিতর থেকে মন্দিরের দোর বন্ধ ছিল। কিন্তু যেই সে কবাটে হাত ঠেকিয়েছে অমনি সহসা দরজা খুলে গেল। কাজলরেখার গা-টা ছম্‌ছম্‌ ক'রে উঠলো। সে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো মন্দিরের মধ্যে। কিন্তু আশ্চর্য্য! যেই সে ভিতরে ঢুক্‌লো অমনি হঠাৎ দ্বার রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

কাজলরেখা অনেক ঠেলাঠেলি কর্‌লে, অনেক চেষ্টা কর্‌লে কিন্তু কিছুতেই পার্‌লে না সেই বন্ধ কপাট দুটোকে খুল্‌তে।

সদাগর জল নিয়ে ফিরে এলো। কিন্তু কাজলরেখা কৈ?

তখন সে সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'কাজল, কাজল' ব'লে।

মন্দিরের মধ্যে থেকে কাজলরেখা সাড়া দিলে। সদাগর বললে, "জল এনেছি, খাবি আয়।"

কাজলরেখা কাঁদ্‌তে লাগল—বল্‌লে, "বাবা, আমি অনেক চেষ্টা কর্‌লুম কিন্তু কিছুতেই দরজাটা খুল্‌তে পার্‌লুম না—তুমি শীগ্‌গির খুলে দাও।"

সদাগর জান্‌তো না যে মন্দিরের মধ্যে কাজলরেখা বন্দিনী। তাই সে তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মার্‌তে লাগল কিন্তু দরজা যেমন বন্ধ তেমনিই রইল। তখন সদাগর দরজা ভাঙবার চেষ্টা কর্‌লে কিন্তু তবুও খুল্‌লো না।

তখন মেয়েকে ডেকে সদাগর বল্‌লে, "মা কাজল, তুমি কি ঘরের মধ্যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছো?"

কাজলরেখা ঘরের মধ্যে চোখ বুলিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো, "বাবা, আমার বড় ভয় কর্‌ছে! তুমি শীগ্‌গির এসো। এখানে একটা মড়া পড়ে আছে, তার সর্ব্বাঙ্গে ছুঁচ বেঁধা। আর তার মাথার কাছে একটা পিদিম জ্বল্‌ছে টিপ টিপ ক'রে।"

সদাগর তখন বল্‌লে, "ও মড়া নয় মা, ও তোর স্বামী। ওকে দেখে ভয় করিস্‌নি। তোর কপালে দুঃখ আছে তা আমি কি কর্‌বো বল্? শুকপাখীর কথাই হাতে হাতে ফল্‌লো।"

এই ব'লে সে আবার বল্‌লে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে জীবিত স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়। তাই ওই মৃত যুবকটির সঙ্গে আজ তোর বিয়ে হ'লো। সূর্য্য, চন্দ্র, বনের দেবতাকে সাক্ষী ক'রে আমি আজ ওর-ই হাতে তোকে সমর্পণ ক'রে জন্মের

মত বিদায় নিচ্ছি। যদি একমনে, একপ্রাণে তাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করতে পারিস্ ত নিশ্চয়ই একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন—ওই মরা স্বামীই আবার বেঁচে উঠবে। আমার কথা মিথ্যে হ'বে না। এ তোর পিতার আশীর্ব্বাদ!"

এই বল্তে বল্তে বাপও যত কাঁদ্তে লাগলো মেয়েও তত কাঁদ্তে লাগলো। দু'জনের কেউ কারো মুখ দেখতে পেলে না। শুধু একজন ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফিরে গেল। আর একজন একাকিনী বন্দিনী হ'য়ে রইল সেই ভগ্নমন্দিরে।

মৃত যুবকটির মাথার কাছে ব'সে ব'সে কাজলরেখা কাঁদ্তে লাগল। চোখের জলে তার বুক ভেসে গেল, তবু সে কান্না থামে না।

এইভাবে বহুক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ দরজায় একটা শব্দ হ'লো।

কাজলরেখা চম্‌কে উঠেই দেখলে দ্বার উন্মুক্ত এবং দীর্ঘ জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

যে বন্ধ দুয়ার খোল্‌বার জন্য তারা বাপ-বেটীতে কত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর করস্পর্শে তা খুলে গেল!

কাজলরেখা ভাবলে নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী কোন যাদুবিদ্যা জানেন। ইচ্ছা করলে হয়ত এখুনি তার মরাস্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন।

তাই সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লো এবং মরাস্বামীকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য অনেক অনুনয়-বিনয় কর্‌তে লাগলো।

সন্ন্যাসী তার প্রতি প্রসন্ন হ'লেন।

তারপর পায়ের ওপর থেকে তার মাথাটা ধীরে ধীরে তুলে দিয়ে বল্‌লেন, "মা, তুই কাঁদিস্ নি—তোর কোন ভয় নেই। এই মৃত যুবকটি এক রাজপুত্তুর—আমি তাকে এখানে এনেছি। ওর দেহ থেকে আগে একটা একটা ক'রে সব ছুঁচগুলো তুই তুলে ফেল্। তারপর স্নান ক'রে এসে শুধু চোখের পাতা দু'টো খুলে, আমি এই যে গাছের পাতা দিয়ে যাচ্ছি তার রস ঢেলে দিস্, তাহ'লেই আবার সে বেঁচে উঠবে।

কিন্তু একটা কথা তোকে সাবধান ক'রে দিই—তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে—কাজেই তাড়াতাড়ি সেটা খণ্ডনের চেষ্টা করিস্ না। যতদিন না আবার শুকপাখী অনুমতি দেবে ততদিন তুই স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দিবি না। যত দুঃখেই পড়না কেন কখনো তাকে জান্‌তে দিবি না যে তুই তার স্ত্রী! আর যদি এই কথা অবহেলা ক'রে নিজের পরিচয় দিস্, তবে যেদিন তাকে বল্‌বি সেইদিন-ই তুই বিধবা হবি, স্মরণ থাকে যেন।"

এই কথা ব'লে কতকগুলো গাছের পাতা কাজলরেখার হাতে দিয়ে সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন।

সন্ন্যাসীর কথামত কাজলরেখা একটি একটি ক'রে ছুঁচ তুল্‌তে লাগলো মৃত কুমারের দেহ থেকে।

সাতদিন, সাতরাত কেটে গেল। এক ফোঁটা জল বা একটু কিছু সে মুখে দিলে না। কিংবা ঘর ছেড়ে একবারও বাইরে বেরুল না।

আটদিনের দিন সকালে সে কেবল স্নান করবার জন্য একটা পুকুরে গিয়ে নামলো।

কিন্তু যেই কাজলরেখা জলে পা ডুবিয়েছে অমনি দেখলে একটা লোক সেই দিকে আস্‌ছে, আর তার পিছনে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের কুমারী মেয়ে।

এই বিজন বনে লোক কোথা থেকে এলো! সে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবতে লাগলো।

ইতিমধ্যে লোকটা তার কাছে এসে বল্‌লে, "মা, একটা ঝি রাখবে?"

তাদের বেশভূষা দেখেই বোধ হচ্ছিল তারা খুব গরীব এবং নীচুঘরের লোক।

কাজলরেখা জিগ্যেস্ কর্‌লে, "এই মেয়েটি তোমার কে?"

লোকটি কাতরস্বরে বল্‌লে, "এটি আমার মেয়ে—পেটের দায়ে বিক্রী কর্‌তে এসেছি মা! কত গ্রামে গ্রামে ঘুর্‌লুম কিন্তু কেন্‌বার মত একজনও লোক পেলুম না। শেষে এক সন্ন্যাসী ব'লে দিলেন,—এই বনের মধ্যে একজন রাজকুমারী আছে তার কাছে যাও, সে ঝি রাখতে পারে। তাই খুঁজতে

খুঁজতে এই দিকে আস্‌ছি। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তুমিই সেই রাজকুমারী,—নেবে মা আমার মেয়েটাকে ?"

কাজলরেখার চোখে জল ভ'রে এলো। এক বাপ মেয়েকে দিয়ে গেছে বনবাস আর এক বাপ পেটের দায়ে বিক্রী কর্‌তে বেরিয়েছে মেয়েকে! কি নিষ্ঠুর! কি হৃদয়হীন!

সেই হতভাগিনী মেয়েটির কথা ভেবে তার বুক ফেটে গেল। কোন কথা না ব'লে হাত থেকে একগাছা সোনার কাঁকন খুলে দিয়ে কাজলরেখা তাকে কিনে নিলে। দুঃখিনী কাজলরেখার দুঃখের দোসর হ'লো! সে তার নাম রাখলে কাঁকনদাসী।

কাজলরেখা তখন মেয়েটিকে সেই ভাঙা মন্দিরটা দেখিয়ে বল্‌লে, "তুমি ওর ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করো,—আমি স্নান ক'রে যাচ্ছি।"

মেয়েটি ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে যেতে লাগল। তখন কাজলরেখা তাকে পিছন থেকে ডেকে বল্‌লে, "হ্যাঁ দ্যাখো, আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। মন্দিরের মধ্যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে, তাকে দেখে তুমি যেন ভয় পেয়ো না। বরং তার মাথার কাছে কতকগুলো গাছের পাতা আছে— সেগুলোকে তুমি ততক্ষণ নিঙ্‌ড়ে রস ক'রে রাখ। আমি গিয়ে তার চোখের ছুঁচ দুটো তুলে দু'ফোঁটা রস দু'চোখে ঢেলে দিলেই সে বেঁচে উঠবে।"

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজলরেখার বাঁ-চোখটা নেচে উঠলো। অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল তার বুকটা।

এদিকে মেয়েটি কর্‌লে কি—মন্দিরের মধ্যে ঢুকে তাড়াতাড়ি সেই পাতাগুলো বাট্‌লে এবং মৃতদেহের দু'চোখ থেকে ছুঁচ দু'টো খুলে ফেলে সেই রস ঢেলে দিলে।

মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ জীবিত হ'য়ে উঠলো।



এমন সময় স্নান ক'রে কাজলরেখা সেখানে ফিরে এলো......

সুন্দর দিব্যকান্তি রাজকুমারকে দেখে মেয়েটি বল্‌লে, "কুমার, আমায় বিয়ে করো।"

রাজকুমার বল্‌লে, "তুমি আমার জীবন দিয়েছো। আমি ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি তোমায় বিয়ে কর্‌বো। আজ থেকে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী—গৃহলক্ষ্মী।"

মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন—এমন কি বংশের কথা পর্য্যন্ত রাজকুমার কাঁকনদাসীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে না। শুধু তার প্রাণদাত্রী ব'লে তাকে বিয়ে কর্‌বার প্রতিজ্ঞা কর্‌লে।

এমন সময় স্নান ক'রে কাজলরেখা সেখানে ফিরে এলো এবং মন্দিরে ঢুক্‌তে গিয়েই চম্‌কে উঠলো! দেখলে তার স্বামী বেঁচে উঠেছে।

কাজলরেখার অসাধারণ রূপ দেখে রাজপুত্র মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

রাজকুমারের এ রকম অবস্থা দেখে নকলরাণী কাঁকনদাসী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—"ও অন্য কেউ নয়, ও আমাদের ঝি—ওর নাম কাজলরেখা।"

আসলরাণী কাজলরেখার কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে রাজপুত্র তাকে দাসী ব'লেই মেনে নিলো।

এদিকে দেবতার বরে রাজকুমারের একে একে সমস্ত কথা মনে পড়তে লাগল। কোথায় তাদের দেশ—কে তার বাপ, কে তার মা, কেনই বা সে এখন এখানে—সব মনে প'ড়ে গেল।

তখন রাজকুমার আর কালবিলম্ব না ক'রে রাণীকে ও দাসীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেল। বাপ-মার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাদের প্রণাম কর্‌লো এবং একে একে সমস্ত ঘটনা বল্‌তে

লাগল। বাপ-মা তখন তাদের হারানিধিকে পেয়ে খুব আনন্দ কর্‌তে লাগল এবং রাজ্যে খুব ধুমধাম প'ড়ে গেল।

এর কিছুদিন পরে বাপ-মা মারা গেলে রাজপুত্র নিজেই রাজা হলো। তখন নকলরাণী কাঁকনদাসীর কথামত কাজলরেখা সব কাজ কর্‌তে থাকে। বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়, জল তোলে, দিনরাত নকলরাণীর সেবা-শুশ্রূষা করে। কিন্তু এত ক'রেও সে তার মন পায় না। নকলরাণী তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অনবরত গালমন্দ দেয় এবং পাছে কাজলরেখা তার পরিচয় দিয়ে ফেলে এই ভয়ে সদাসর্ব্বদা সে চোখে চোখে রাখতো কাজলরেখাকে।

কিন্তু রাজকুমারের মনে ক্রমশঃই সন্দেহ বাড়তে লাগল। যতই সে কাজলরেখাকে দেখতে লাগল, ততই তার চালচলন, ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা এবং সকলের ওপর তার অনন্যসাধারণ রূপ দেখে মনে হ'তে লাগল, কিছুতেই সে দাসী হ'তে পারে না। নিশ্চয়ই কোন ভদ্রঘরের মেয়ে পরিচয় গোপন ক'রে আছে।

রাজকুমার নানারকম ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজলরেখাকে জিজ্ঞাসা করে তার পরিচয়, কিন্তু কিছুতেই সে তার সঠিক পরিচয় দেয় না। তখন সে ভেবে আকুল হয়, কে এই রহস্যময়ী নারী?

সন্ন্যাসী ব'লেছিলেন, স্বামীকে আত্ম-পরিচয় দিলেই জন্মের মত বিধবা হবে। এই কথাটি কাজলরেখার মনে জলন্ত অক্ষরে লেখা ছিল। তাই শত অনুরোধ সত্ত্বেও সে রাজকুমারকে তার

পরিচয় দিলে না। এইভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে লাগল। এ-যে তার বরাতের লিখন, কে খণ্ডাবে ?

এদিকে যত দিন যেতে লাগল নকলরাণীর স্বভাব-চরিত্রে রাজকুমার তত বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। হাজার হোক্, সে ত ছোট-ঘরের মেয়ে ! তার চালচলন, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার সবই যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকতে লাগল ! তার মধ্যে যেন কোন রুচি নেই, কোন শোভনতাবোধ নেই। রাজরাণীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ব'লে তাকে মনে হ'তে লাগলো।

আর কাজলরেখার সব কাজই রাজপুত্রের ভাল লাগতে লাগল। তার রূপে, গুণে সে এমন মুগ্ধ হ'য়ে গেল যে তার পরিচয় জানবার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগল তার প্রাণ। রাজ্য, রাজধানী, ধনদৌলত—সবই তার শূন্য মনে হ'তে লাগলো। রাজপুত্র আহার করে না, নিদ্রা যায় না, রাজকার্য্যে মনোযোগ দিতে পারে না।

শেষে একদিন রাজকুমার বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লে, "আমার মন বড় খারাপ—মাস ছয়েকের জন্যে আমি দেশভ্রমণে যাবো। ইতিমধ্যে কিন্তু তোমাকে একটি কাজ কর্‌তে হবে—যেমন ক'রে পারো এই দাসীর পরিচয় সংগ্রহ কর্‌তে হবে।"

মন্ত্রী বল্‌লে, "যে আজ্ঞে, যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌বো।"

রাজকুমার নকলরাণীর কাছে গিয়ে বল্‌লে, "আমি দেশভ্রমণে যাচ্ছি—তোমার জন্যে কি কি জিনিষ আন্‌তে হবে বলো।"

সে তাড়াতাড়ি একগাদা জিনিষের ফর্দ্দ দিলে। বেতের বাক্স,

কুলো-ধুচুনী, তেঁতুল কাঠের ঢেঁকী, পিতলের নথ, কাঁসার মল এবং ওই রকমের আরো কত কি জিনিষ!

রাজকুমার অবাক্ হ'য়ে গেল তার এই বিশ্রী পছন্দ দেখে।

তারপর সে গেল আসলরাণী কাজলরেখার কাছে। কাজল-রেখা তাকে বল্‌লে, "রাজকুমার, আমার কিছুই চাই না—আমার জন্যে কষ্ট ক'রে কোন জিনিষ আন্‌তে হবে না। আমি এখানে খুব সুখে আছি—কোন কিছুর অভাব নেই আমার!"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তা হবে না—আমি তোমার কোন কথা শুন্‌বো না। তোমার মনের মতন যে-কোন একটা জিনিষ আজ আমার কাছে প্রার্থনা কর্‌তেই হবে।"

তখন কাজলরেখা বল্‌লে, "একান্তই যদি আমার জন্যে একটা জিনিষ আন্‌তে হয় ত একটি শুকপাখী কিনে এনো।"

রাজকুমার সন্তুষ্ট হ'য়ে চ'লে গেল।

কিন্তু বিপদ হ'লো ভারী! নকলরাণী যা যা আন্‌তে বলেছিল তা পেতে রাজকুমারের একটুও বিলম্ব হ'লো না। কিন্তু কাজলরেখার জন্য শুকপাখী আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

একরাজ্য থেকে আর একরাজ্য,—একদেশ থেকে আর একদেশ রাজকুমার ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এদিকে ছ'মাস প্রায় শেষ হ'য়ে এলো কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত শুকপাখীর কোন সন্ধান কর্‌তে না পেরে মহাচিন্তায় পড়লো রাজকুমার!

এইভাবে আরো কয়েক দিন ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে রাজকুমার শেষে

গিয়ে হাজির হ'লো, একেবারে কাজলরেখার বাপের দেশে—ভাটিয়ালগ্রামে।

সেখানে গিয়েই রাজকুমার ঢাক পিটিয়ে দিলে যে তার একটি শুকপাখী চাই। যে এনে দিতে পার্বে তাকে সে প্রচুর পুরস্কার দেবে।

সাধু ধনেশ্বরের কানে এই কথা গেল। সে জান্তো যে, তার কন্যা ছাড়া এ পাখীর সন্ধান আর কেউ জানে না। তখনি তার মনে হ'লো, এ পাখী নিশ্চয়ই কাজলরেখার দরকার। তাই সাধু ধনেশ্বর আর কালবিলম্ব না ক'রে সেই পাখীটি নিয়ে গিয়ে রাজকুমারকে দিলে।

প্রচুর পুরস্কার দিয়ে রাজকুমার তাকে বিদায় কর্লে এবং মনে মনে ভাবলে, "যাক্ কাজলরেখার মান যে রক্ষা কর্তে পেরেছি এই যথেষ্ট।"

রাজকুমার দেশে গিয়ে নকলরাণীকে তার জিনিষগুলি দিলে আর কাজলরেখাকে দিলে সেই শুকপাখীটি।

এদিকে মন্ত্রী কর্লে কি—রাজকুমারের অবর্ত্তমানে রাজ্যের যত গুরুতর বিষয়-আশয়ের কথা নকলরাণী ও কাজলরেখার সঙ্গে পরামর্শ কর্তে লাগলো।

নকলরাণী কিছুই বুঝতো না, তবুও এমন এক-একটা কাজের হুকুম দিলে যে তাতে রাজ্যের ভীষণ ভীষণ ক্ষতি হ'তে লাগলো।

এই সময় একটা ভয়ানক অশান্তি দেখা দিল রাজ্যে।

মন্ত্রী অনেক ভেবেচিন্তে তার কোন উপায় স্থির কর্‌তে না পেরে শেষে কাজলরেখার পরামর্শ চাইল।

কাজলরেখা মন্ত্রীকে এমন যুক্তি দিলে যে তাতে ক'রে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত অমঙ্গল দূর হ'য়ে গেল।

কাজলরেখার নামে তখন ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল।

রাজকুমার দেশভ্রমণ থেকে ফিরে আস্‌তেই মন্ত্রী চুপিচুপি তাকে সেই সব কথা জানালে। আর এ-ছাড়াও অন্য উপায়ে তাদের পরীক্ষা কর্‌বার মতলব দিলে।

মন্ত্রী বল্‌লে, "পর পর দু'দিন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানো যাক। আর সেই রান্নার ভার একদিন পড়ুক কাজলরেখার ওপর—একদিন পড়ুক নকলরাণীর ওপর।"

রাজকুমার মন্ত্রীর কথামতই কাজ কর্‌লে।

প্রথম দিন রান্নার ভার পড়লো নকলরাণীর ওপর।

রাজকুমার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসলো। নকলরাণী তাদের পাতে পরিবেষণ কর্‌লো—কড়াইয়ের ডাল, কচুর শাকের তরকারী আর তেঁতুলের অম্বল। বন্ধু-বান্ধবদের সাম্‌নে এই সব খাবার দেখে রাজকুমার লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রইলো।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা স্নান ক'রে এসে কাজলরেখা রান্নাঘরে ঢুক্‌লো। অনেক বেলা পর্য্যন্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাক ক'রে ঘর ভরিয়ে দিলে সে।

সরু চালের ভাত, ভাল ভাল মাছের কালিয়া, পোলাও, পিঠে-পায়েস, ক্ষীরের চন্দ্রপুলি প্রভৃতি নানা রকম খাবার সোনার

থালায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে সাজিয়ে গুজিয়ে রাজকুমার ও তার বন্ধুদের খেতে দিলে। তারা সবাই অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হ'য়ে খেয়ে উঠলো। কারো পাতে কিছু পড়ে রইল না।

তারপর খাওয়া শেষ হ'তেই কাজলরেখা সোনার পাত্র ক'রে তাদের হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিলে এবং কেয়াখয়ের-দেওয়া সুগন্ধ পান সেজে খেতে দিলে। খুশীতে রাজকুমারের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু পরীক্ষা এতে-ও শেষ হ'লো না।

আবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিন রাত্রে রাজকুমার তাদের দু'জনকে আল্পনা দিতে বল্লে পূজোর জায়গায়। এবার সাবধান ক'রে দিয়ে বল্লে, "পূজো দেখতে বহুলোক আস্বে, কাজেই আল্পনা যেন যতদূর সম্ভব সুন্দর হয়।"

নকলরাণীর আল্পনা দেখে সবাই বল্লে, বিশ্রী। কতকগুলো কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং, তেঁতুল পাতা, ধানের শিষ ছাড়া আর কিছুই সে আঁকেনি। রাজকুমার ভারী চটে গেল।

তারপর সবাই গেল কাজলরেখার আল্পনা দেখতে। তার হাতের সুন্দর কারুকার্য্য দেখে সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেল। কত সুন্দর দেবদেবীর ছবি, কত মন্দির, কত পদ্মপাতা, রাজহাঁস, পাহাড়-পর্ব্বত, নদীর তীর, ভাঙা মন্দিরের মাঝে শুয়ে আছে রাজপুত্র—তার সর্ব্বাঙ্গে ছুঁচ-বেঁধা—কাজলরেখা এঁকেছে।

তখন রাজকুমার, মন্ত্রী, পাত্রমিত্র—সবাই এবিষয়ে একমত

হ'লো যে, কাজলরেখা নিশ্চয়ই কোন ভদ্রবংশের মেয়ে—পরিচয় গোপন ক'রে দাসী হ'য়ে আছে।

এইভাবে দশ বছর কেটে গেল।

এদিকে শুকপাখীর কাছে কাজলরেখা রোজ গোপনে কান্না-কাটি করে এবং জিগ্যেস করে তার বাপ-মা-ভাইয়ের খবর—জিগ্যেস করে কবে তার এই দুঃখের শেষ হবে?

একদিন গভীর রাত্রে শুকপাখী কাজলরেখাকে ডেকে বল্‌লে, "তোমার বাপ-মা-ভাই—সবাই ভাল আছে কিন্তু তোমার অভাবে তারা দিনরাত কাঁদে, কারো মনে সুখ নেই। আর তোমার দুঃখ শেষ হ'তে আরো দু'বছর দেরী।"

"আরো দু'বছর?—সে-যে অনেকদিন!" এই ব'লে কাজলরেখা রোজ রাত্রে কাঁদে!

এইভাবে কাট্‌লো আরো কিছুদিন। তারপর এক নূতন ঘটনা ঘট্‌লো।

রাজকুমারের এক বন্ধু কাজলরেখাকে দেখে বিয়ে কর্‌বার জন্য পাগল হ'য়ে উঠলো। সে গোপনে নকলরাণীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তে লাগলো।

তাতে নকলরাণীর উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কাজলরেখা তার চক্ষুশূল! তার ওপর অনবরত রাজকুমারকে তার রূপ-গুণের প্রশংসা কর্‌তে শুনে হিংসায় তার বুক ফেটে যেতো। সে কাজলরেখাকে সকলের চোখে হীন ও দুশ্চরিত্র প্রমাণ কর্‌বার জন্য এক ষড়যন্ত্র কর্‌লে।

বেচারী কাজলরেখা এ সবের কিছুই জান্‌তো না।

নকলরাণী কুচক্রে ফেলে তাকে রাজকুমারের বিষ নজরে ফেল্‌লে।



নকলরাণীর সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধিতে দাসী কাজলরেখা পেরে উঠবে কেন? রাজকুমার তখুনি কলঙ্কিনী কাজলরেখাকে বনবাস দেবার হুকুম দিলেন।

কাজলরেখা কেঁদে আকুল হ'য়ে রাজকুমারের হাতে পায়ে

ধর্‌তে লাগল। বল্‌লে, "আমি নিষ্পাপ, কোন দোষ করিনি—আমাকে রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিও না। বাইরে কুকুর-বিড়ালের মত কোথাও পড়ে থাক্‌বো।"

রাজকুমার তার কথায় কর্ণপাত কর্‌লে না। সেই বন্ধুর সঙ্গে একটা ডিঙি ক'রে সেইদিন-ই তাকে বাড়ী থেকে বিদায় ক'রে দিল।

কত গ্রাম, কত নদ-নদী পার হ'য়ে ডিঙি ছুট্‌লো। শেষে এক অকূল সমুদ্রের মাঝে গিয়ে তারা পড়লো। যেদিকে চায় সেদিকেই অনন্ত নীলজলরাশি মিশে গেছে যেন আকাশের সঙ্গে।

কাজলরেখা কাঁদ্‌তে লাগল তার অদৃষ্টের কথা ভেবে।

রাজকুমারের বন্ধু তখন কাজলরেখাকে একলা পেয়ে বল্‌লে, "তুমি যদি আমায় বিয়ে করো ত তোমাকে বনবাসে না দিয়ে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাবো—আমিও রাজকুমার। সেখানে আমারও রাজপ্রাসাদ আছে—তুমি হবে রাজরাণী। সোনার খাটে শুয়ে থাক্‌বে, কালিয়া-পোলাও খাবে, দাসদাসী তোমার হুকুমে উঠবে বস্‌বে। তোমার আর কোন দুঃখ থাক্‌বে না।"

কাজলরেখা তার প্রস্তাবে রাজী হ'লো না। সে বল্‌লে, "আমি দাসী, তায় কলঙ্কিনী। আপনি রাজকুমার, আমাকে বিয়ে কর্‌লে আপনার সম্মানের হানি হবে—লোকে আপনার কুযশ গাইবে। তার চেয়ে এইখানে আমায় ডুবিয়ে দিন—আমি জন্মের মত সকল দুঃখের হাত থেকে রক্ষা পাই।" এই ব'লে সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ডিঙি থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল।

রাজকুমারের বন্ধু তার হাতটা ধ'রে ফেলে বল্‌লে, "আমি কিছুতেই তোমায় আত্মহত্যা কর্‌তে দেবো না। তুমি আজ থেকে আমার রাণী হ'য়ে থাক্‌বে আমার রাজপুরী আলো ক'রে।" এই ব'লে সে মাঝিকে হুকুম দিলে তার দেশের দিকে যেতে।

ডিঙির মুখ ঘুর্‌লো। অন্যপথে সে ভরা-পালে ছুটে চল্‌লো।

কাজলরেখা দেখলে বিপদ আরো বাড়লো। এখন কি ক'রে এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাই চিন্তা কর্‌তে লাগলো।

সে অনেক অনুনয়-বিনয় কর্‌লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। রাজকুমারের বন্ধু তার কথায় কর্ণপাত কর্‌লে না।

তখন কাজলরেখা হাতদুটো জোড় ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে, "মা সতীকুলরাণী, তুমি জানো এই হতভাগিনীর সকল দুঃখের কথা! কোন দোষ করিনি, তবুও স্বামীর চোখে আজ আমি অপরাধিনী। যদি কায়মনোবাক্যে স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজো ক'রে থাকি—যদি আমি সতীসাধ্বী হই, তবে এই দুর্বৃত্তের হাত থেকে আমায় রক্ষা করো মা—এই মুহূর্তে যেন সমুদ্রে চড়া পড়ে যায়।"

যেই এই কথা কাজলরেখা মুখ দিয়ে উচ্চারণ কর্‌লে অমনি সমুদ্রে চড়া প'ড়ে নৌকো আট্‌কে গেল।

দাঁড়ি-মাঝিরা একবাক্যে ব'লে উঠলো, "এ মেয়ে ডাইনী, একে শীগ্‌গির নামিয়ে দাও ডিঙি থেকে।"

রাজকুমারের বন্ধুও আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দিলে সেখানে।

দেখতে দেখতে তখুনি আবার সমুদ্র জলে ভরে গেল—ডিঙি ভেসে উঠলো। রাজকুমারের বন্ধু লোকজন নিয়ে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে গেল দেশে।

জনমানবহীন সেই সমুদ্রের চড়ায় একাকিনী কাজলরেখা দিন কাটাতে লাগলো। শরকলমীর দাম ছাড়া অন্য কিছু সেখানে ছিল না। ক্ষুধার তাড়নায় পশুর মত সেইগুলো চিবিয়ে খেয়ে কোন রকমে কাজলরেখা প্রাণে বেঁচে রইলো।

এদিকে ততদিনে ধনেশ্বরের সংসারে কত পরিবর্ত্তন ঘট্‌লো। কাজলরেখার বাপ-মা মারা যেতে তার ভাই সাধু রত্নেশ্বর বাপের ডিঙি নিয়ে বাণিজ্য কর্‌তে বেরুল।

নানা দেশ ঘুরে ব্যবসা ক'রে সে ফিরে আস্‌ছে, এমন সময় একদিন হঠাৎ ঝড়-তুফানে প'ড়ে তার ডিঙি একেবারে গিয়ে আট্‌কাল সেই চড়ায়।

ভাই বোনকে চেনে না। বোনও ভাইকে চেনে না। অতি শৈশবে তাদের হ'য়েছে ছাড়াছাড়ি।

রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে দেখে মুগ্ধ হ'লো এবং অনেক মিনতি ক'রে শেষে তাকে নিজের দেশে নিয়ে যেতে রাজী করালে।

কিন্তু রত্নেশ্বরের বাড়ীতে পা দিয়েই কাজলরেখা চিন্‌তে পার্‌লে, এ তার নিজের বাড়ী। সেই ঘর, সেই দোর, সেই

সব। সে কাউকে কিছু না ব'লে শুধু কাঁদ্‌তে লাগল। তার বাপ মারা গেছে—মা-ও মারা গেছে। পুরোনো লোকজন—তারাও অবস্থা খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে।

একদিন দু'দিন ক'রে তিন মাস কেটে গেল।

একদিন সন্ধ্যার সময় রত্নেশ্বর কাজলরেখাকে গিয়ে বল্‌লে, "তোমাকে হাঙ্গর, কুমীরের মুখ থেকে রক্ষা ক'রে এখানে এনেছি শুধু বিয়ে কর্‌বো ব'লে। এই বাড়ীঘর সবই আমার কিন্তু স্ত্রী বিহনে সব অন্ধকার হ'য়ে আছে। তুমি যদি অনুমতি দাও ত কালই তোমায় বিয়ে করি। লোকজন, নাপিত, পুরোহিত—সবই আমি বাড়ীতে এনে ঠিক ক'রে রেখেছি। শুধু একবার তুমি বলো আমায় বিয়ে কর্‌বে।"

কাজলরেখা বল্‌লে, "আমার এক সত্য আছে—সেটা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তোমায় কথা দিতে পারি না। তা'ছাড়া আমার গোত্র, নামধাম না জেনে শুনে কোন্‌ শাস্ত্র অনুসারে তুমি আমায় বিয়ে করবে?"

রত্নেশ্বর বল্‌লে, "রাজরাণীর মত যাকে দেখতে সে কি কখনো হাড়ি-মুচি হ'তে পারে? নিশ্চয়ই কোন উঁচু বংশে তোমার জন্ম। সত্যি ক'রে বলো, তোমার কোথায় বাড়ী, বাপ-মার নামই বা কি?"

কাজলরেখা বল্‌লে, "আমার পরিচয় আমি নিজমুখে বল্‌তে পার্‌বো না। সূচরাজার ঘরে একটা শুকপাখী আছে, সে-ই আমার বিয়ের ঘটক, তাকে জিগ্যেস কর্‌লে সব জান্‌তে পার্‌বে।"

রত্নেশ্বর তখনি লোক পাঠালে সূচরাজার কাছ থেকে সেই পাখীটা আন্‌বার জন্যে। ডিঙি-ভরা ধনরত্ন নিয়ে লোক গেল সূচরাজার দেশে।

সূচরাজা তখন বাড়ী ছিলো না, দেশভ্রমণে বেরিয়েছিল। কাজলরেখাকে বনবাসে পাঠিয়েই সে তার ভুল বুঝতে পার্‌লে এবং তখনি নৌকো নিয়ে এদেশ ওদেশ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল কাজলরেখার খোঁজে।

সেই অবসরে রত্নেশ্বর সাধুর লোক সূচরাজার বাড়ীতে গিয়ে সেই শুকপাখীটা চাইলে।

নকলরাণী ধনরত্নের লোভ সাম্‌লাতে না পেরে চুপিচুপি পাখীটাকে তাদের কাছে বিক্রী ক'রে দিলে।

পাখী নিয়ে তখনি রত্নেশ্বর সাধুর লোক দেশে ফিরে গেল।

এদিকে কতদিন কেটে গেল তবুও সূচরাজা কাজলরেখার কোন সন্ধান কর্‌তে পার্‌ল না। তারপর এমনিভাবে দেশে দেশে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে শেষে একদিন সে রত্নেশ্বরের দেশে গিয়ে পৌঁছল।

পাখী হাতে পেয়েই রত্নেশ্বর ঢাক-ঢোল বাজিয়ে দেশে ঘোষণা ক'রে দিলে যে, সে সমুদ্র থেকে এক জলপরী ধ'রে এনেছে—আজ তার সঙ্গে তার বিয়ে হবে এবং আরো ঘোষণা ক'রে দিলে যে, একটা শুকপাখী সভার মাঝে সকলের সাম্‌নে সেই পরীর জন্ম-বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর্‌বে।

যে শুন্‌লে সে-ই অবাক্ হ'য়ে গেল এবং এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দেখবার জন্য সবাই সব কাজ ফেলে ছুট্‌লো সাধু রত্নেশ্বরের বাড়ী।

সুচরাজাও এই কৌতূহল সংবরণ কর্‌তে পার্‌লে না। অন্য লোকেদের সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হ'লো।

বিরাট্ সভা। চারিদিকে লোকজন গিস্‌গিস্ কর্‌ছে। মাঝখানে ব'সে আছে সাধু রত্নেশ্বর আর কাজলরেখা।

এমন সময় একটা সোনার খাঁচায় ক'রে শুকপাখীকে সেখানে নিয়ে আসা হ'লো। খাঁচার দরজা খুলে দিতেই শুকপাখী তার ওপরে গিয়ে উঠে বস্‌লো। তারপর একে একে বল্‌তে লাগল কাজলরেখার জীবনের ইতিহাস।

—কাজলরেখা সাধু ধনেশ্বরের মেয়ে। কেন তার বাপ তাকে বনবাস দিলে? কেমন ক'রে মরা স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হ'লো। —কেমন ক'রে কাঁকনদাসী নিজে রাণী হ'য়ে তাকে দাসী বানিয়ে রাখলে—কেমন ক'রে ভ্রমবশতঃ রাজা তাকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে আবার বনবাসে দিলে—কেমন ক'রে রাজার বন্ধু তাকে বিয়ে কর্‌তে চাইলে—কেমন ক'রে সমুদ্রে চড়া পড়লো—কেমন ক'রে আপন ভাই রত্নেশ্বর তাকে নিজের বাড়ীতে এনে বিয়ে করতে চাইলে।

একে একে কাজলরেখার জীবনের ইতিহাস ব'লে শুকপাখী তিন্‌তলার ছাদে উড়ে গিয়ে বস্‌লো এবং সেখান থেকে আবার সুচরাজার জন্ম-বৃত্তান্ত বল্‌তে লাগলো।

চম্পানগরে সাধু হীরাধর নামে এক রাজা ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত কোন ছেলেপুলে না হওয়ায় তার মনে মোটে সুখ ছিল না। ছেলে হওয়ার জন্য রাজা অনেক দেবদেবীর আরাধনা করলে—পূজো, মানসিক প্রভৃতি কত কি করলে কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। শেষে একদিন এক সন্ন্যাসী এসে তার হাতে একটি আম দিয়ে বললে, "এইটে রাণীকে খাওয়ালেই ছেলে হবে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীকে সেই আমটা খাইয়ে দিলে।

দশ মাস দশ দিন পরে রাণীর এক মরা ছেলে হ'লো।

ঠিক সেই সময় আবার সেই সন্ন্যাসী এসে দেখা দিল এবং সেই মরা শিশুটীর সর্ব্বাঙ্গে সূচ বিঁধিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে রেখে এলো। তারপর সেই নির্জ্জন জঙ্গলে একটা মন্দির গেঁথে তার মধ্যে সেই শিশুটীকে রেখে দিলে।

দেবতার বরে সেই মরা শিশুটী তিল তিল ক'রে বাড়তে লাগলো। এইভাবে বাড়তে বাড়তে একদিন যখন তার যৌবন এলো, দেবতার বরে কাজলরেখাও সেইখানে গিয়ে মিলিত হ'লো।

আজ কাজলরেখার ব্রতের বারো বছর পূর্ণ হ'লো। আজ তার সকল দুঃখের অবসান হ'লো। তাই সমস্ত কথা আজ ব'লে গেলুম।

এই ব'লে শুকপাখী উড়ে গেল আকাশে।

সূচরাজা তখন ছুট্‌তে ছুট্‌তে ভীড় ঠেলে একেবারে কাজলরেখার কাছে গিয়ে হাজির হ'লো।

তখন রত্নেশ্বর নিজের বোনকে চিন্‌তে পার্‌লে এবং বিয়ের প্রস্তাব করার জন্য তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌লে।

তারপর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রত্নেশ্বর সেইখানে বোন কাজলরেখা ও সূচরাজার বিয়ে দিয়ে দিলে।

সূচরাজা তখন কাজলরেখাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে গেল এবং কাজলরেখাকে বাড়ীর বাইরে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে বাড়ীর উঠানে একটা মস্ত বড় গর্ত্ত তৈরী করালে।

এমন সময় নকলরাণী ছুটে এসে সূচরাজাকে গর্ত্ত খোলার কারণ জিগ্যেস কর্‌লে।

সূচরাজা বল্‌লে, "আজ আমাদের বাড়ী লুঠ কর্‌তে আস্‌বে একদল ডাকাত; তাই আমাদের সব ধনরত্ন নিয়ে এর মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌তে হবে।"

যেই সেই কথা শোনা অমনি নকলরাণী নিজের গয়নাপত্তর নিয়ে সকলের আগে তার মধ্যে গিয়ে লুকালো।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা লোকজনদের ইঙ্গিত করলে। তারা সকলে একসঙ্গে সেই গর্ত্তে মাটি চাপা দিলে।

এই ভাবে নকলরাণীর মৃত্যু হ'লো। আর আসলরাণী কাজলরেখা সূচরাজার সঙ্গে মনের সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো।

ফুলকুমার

গ্রামের নাম ভরাই।

সেখানে বাস কর্‌তো এক সদাগর। ধন-দৌলত তার এতো ছিলো যে লোকে তাকে বল্‌তো লক্ষ্মীর বরপুত্র। কিন্তু এতো থাকা সত্ত্বেও তার মনে সুখ ছিলো না। কে ভোগ কর্‌বে এই ঐশ্বর্য্য? সে ছিলো নিঃসন্তান। ছেলে বা মেয়ে ভগবান্ তাকে একটিও দেয়নি। তাই সংসারের দিকে চাইলে তার মনে হ'তো সব অন্ধকার! বুকের মধ্যেটা জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যেতো! পুত্রহীন গৃহ মরুভূমির সমান! তাই কেবলই সে কাঁদ্‌তো আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌তো সন্তান!

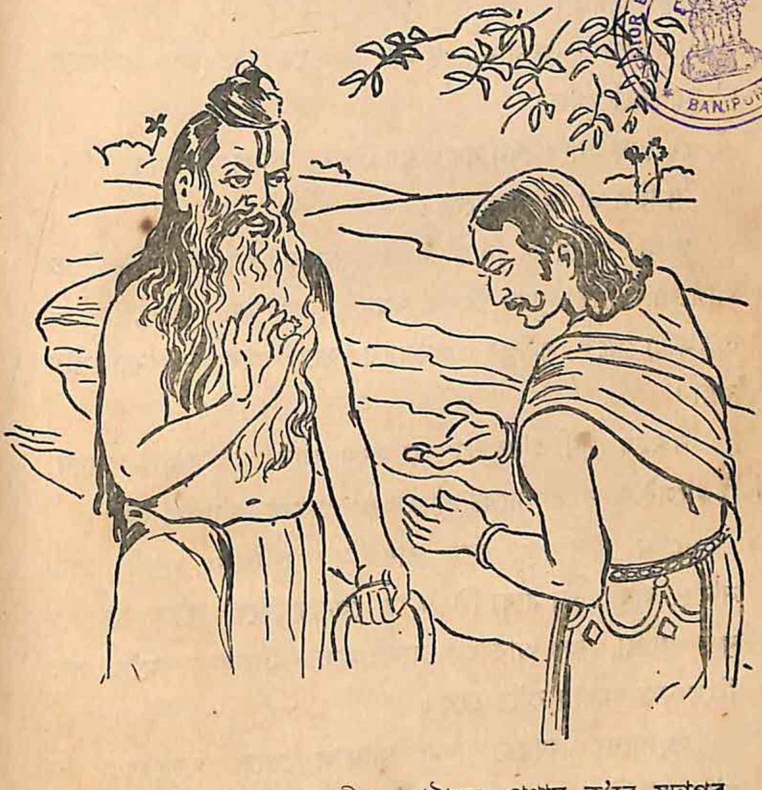
এইভাবে বহুদিন কেটে গেল। কিন্তু তবুও কোন সন্তান হ'লো না দেখে একদিন সদাগর মনের দুঃখে নদীতে ডুবে মর্‌তে গেল।

ঠিক সেই সময় একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন নদীর ধার দিয়ে। সদাগর তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদ্‌তে লাগলো।

সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'লো। তিনি সদাগরের হাতে একটা ফল দিয়ে বল্‌লেন, "এইটে শনি কি মঙ্গলবার রাণীকে খাইয়ে দিলেই, তোমার একটি পরমসুন্দরী মেয়ে হবে।"

সদাগর আবার তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে মাথায় দিল। উঠে দাঁড়াতেই সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "কিন্তু সাবধান, তার বয়েস

ন'বছর পূর্ণ হ'লেই বিয়ে দিয়ো। তা না হ'লে ঘোরতর অশান্তি দেখা দেবে। তার পাপে তোমার দেহে শনি ঢুক্‌বে এবং রাজ্য পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে।"



"তথাস্তু" ব'লে সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে সদাগর বাড়ীতে ফিরে গেল। এবং পরবর্তী শনিবারে সেই ফলটি খাইয়ে দিলে রাণীকে।

তার ঠিক দশমাস দশদিন পরে রাণীর একটি মেয়ে হ'লো। কিন্তু মেয়ে জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হ'লো।

সদাগর পত্নীর শোক সেই পদ্মফুলের মত মেয়েটিকে বুকে ক'রে ভুলে গেল।

এইভাবে একমাস, ছ'মাস করতে করতে একবছর দু'বছর কেটে গেল।

মেয়েকে পেয়ে যেন সদাগরের ঐশ্বর্য্য উথলে উঠলো।

যা ছিল তা দ্বিগুণ হ'লো।

তখন মেয়েকে নিয়ে পরম আনন্দে তার দিন কাট্‌তে লাগলো। নিত্য নূতন উৎসব, সমারোহ, খাওয়া-দাওয়া, হৈ-চৈ-এর মধ্যে থেকে সদাগর একেবারে ভুলে গেল সেই সন্ন্যাসীর কথা।

ন'বছর পূর্ণ হ'তে মেয়ের যখন আর মাত্র ন'দণ্ড বাকী, ঠিক সেই সময় সদাগরের হঠাৎ মনে পড়লো সন্ন্যাসীর কথা।

এখন উপায়? ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল। মাত্র ন'দণ্ড বাকী, এর মধ্যে কি ক'রে মেয়ের বিয়ের ঠিক কর্‌বে? কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে—একমাত্র মেয়ে, তার বিয়ে কত ধূমধাম ক'রে হবে।

সদাগরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো! কি হ'বে এই চিন্তা কর্‌তে কর্‌তেই আরো ছ'দণ্ড কেটে গেল।

মাত্র তিনদণ্ড আর বাকী! সদাগরের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে গেল। হাত-পা ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

আরো দু'দণ্ড কেটে গেল। তখন সদাগর মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, এখুনি যার মুখ দেখতে পাবো তারই হাতে মেয়েকে সঁপে দেবো।

এমন সময় দৈবপ্রেরিতের মত এক ভিখিরী বামুন এসে হাজির হ'লো সদাগরের কাছে।

অতিবৃদ্ধ। সমস্ত দেহ তার বেঁকে গেছে। হাত-পা কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ ক'রে, একটা মোটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে সে একেবারে সদাগরের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কোলে একটী ছ'মাসের শিশুপুত্র, দু'চোখ তার অন্ধ। সদাগরের হাতে সেই ছেলেটীর ভার সমর্পণ ক'রে ব্রাহ্মণ কাশী গিয়ে বাকী দিন ক'টা কাটাতে চায়। ভিক্ষা ক'রে সে নিজের পেট-চালাতে পারে না, তার ওপর এই শিশুর দুধ কেমন ক'রে জোগাবে! তাই ধনী সদাগরের কাছে এসেছে মাতৃহীন শিশুটীকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে।

সদাগর আর একমুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে সেই অন্ধ পুত্রটীকে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে নিয়ে নিলে। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে গেল।

তখন সেই অন্ধ শিশুটীকে কোলে নিয়ে সদাগর মেয়ের কাছে গেল।

সদাগর মেয়ের নাম রেখেছিল কাঞ্চনমালা। ন'বছরের মেয়ে যেন সোনার প্রতিমা! চাঁদের মত মুখ, পদ্মের পাপড়ির মত বড় বড় চোখ, মেঘের মত কালো একরাশ চুল মাথা থেকে একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়েছে।

মেয়েকে দেখে সদাগরের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। শুধু ঝর্‌ঝর ক'রে জল পড়তে লাগল দু'চোখ বেয়ে।

বাপের চোখে জল দেখে কাঞ্চনমালার বুক ফেটে যেতে লাগল। সেও তখন কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাপকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "শিশুটী কে!"

সদাগর তখন শিশুটীকে কাঞ্চনমালার হাতে সঁপে দিয়ে সেই সন্ন্যাসীর কথা একে একে বল্‌লে মেয়েকে।

কাঞ্চনমালার ভাগ্যে ছিল সেই ছ'মাসের শিশু অন্ধস্বামী! তাই সে বাপকে কিছু না ব'লে অন্ধশিশুটীকে বুকে চেপে ধ'রে কাঁদ্‌তে লাগলো ডুক্‌রে ডুক্‌রে।

মেয়ের এই দুঃখ চোখের সাম্‌নে সহ্য কর্‌তে না পেরে সদাগর সেখান থেকে চ'লে গেল।

কাঞ্চনের কান্না আর থামে না। মৃত মায়ের কথা মনে প'ড়ে আরো বেড়ে যায়। মা যদি বেঁচে থাক্‌তো তা হ'লে কি তার বাবা এই অন্ধশিশুটীর সঙ্গে বিয়ে দিতে পার্‌তো। এই ব'লে নিজের সুখ-দুঃখ ও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে সে পাগলের মত হ'য়ে গেল, এবং একদিন রাত্রে অন্ধকারে সে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল।

গভীর রাত। লোকজন যে-যার বাড়ীতে ঘুমিয়েছে। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। তার ওপর পথঘাট সব অজানা অচেনা। কোন্ দিকে যাবে কাঞ্চনমালা নিজেই জানে না।

তাই পথ ঠিক কর্‌তে না পেরে যেতে যেতে সে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়্‌লো।



বনজঙ্গল ভেদ ক'রে সে চল্‌তে লাগলো সেই শিশুটীকে বক্ষে নিয়ে। কাঁটায় তার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গেল। পা দিয়ে রক্ত ঝর্‌তে লাগলো। শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে সে

একটা বটগাছের তলায় ব'সে পড়্লো এবং ব্যাকুলভাবে কাঁদ্‌তে লাগলো।

সেই বটগাছটা ছিলো ফাঁপা। তার কোটরের মধ্যে বাস কর্‌তেন এক সন্ন্যাসী। এত রাত্রে কে কাঁদ্‌ছে দেখবার জন্য তিনি বাইরে এলেন। কাঞ্চনমালাকে সেই অবস্থায় দেখে তিনি জিগ্যেস করলেন, "তুমি কোথায় যাবে? আর কেনই বা এখানে ব'সে কাঁদ্‌ছো ?"

কাঞ্চনমালা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সমস্ত কথা তাঁকে বল্‌লে। সন্ন্যাসীর মনে দয়া হ'লো। তিনি বললেন, "আজ রাত্তিরটা তুমি এই কোটরের মধ্যে থাক তারপর কাল সকালে যাহোক্ একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

কাঞ্চনমালা তাঁর কথামত রাত্তিরটা সেই গাছের কোটরে কাটিয়ে দিল।

ভোর হ'তেই সন্ন্যাসী বনের ভেতর থেকে একটা ফল সংগ্রহ ক'রে আনলেন এবং সেইটা কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "এইটা ওই শিশুটীকে খাইয়ে দাও তাহ'লে এখুনি সে চক্ষুষ্মান হ'য়ে উঠবে। তারপর এই বনের পথে বরাবর পূবদিকে এগিয়ে গেলেই কতকগুলো কাঠুরিয়াদের ঘর দেখতে পাবে--সেখানে গিয়ে তোমার স্বামীকে নিয়ে থাকো। তু'মাসের বাড় এই শিশুটী একদিনে বাড়বে। তাছাড়া, আবার যদি কোনদিন কোন বিপদে পড়ো ত আমাকে স্মরণ ক'রো।" এই ব'লে সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ সেই গাছের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

ফলটী শিশুকে খাওয়াতেই সে চোখমেলে চাইলো। তখন কাঞ্চনমালার বুকে বল এলো। সে সন্ন্যাসীর উপদেশ মত পূবদিকে চল্‌তে লাগলো।

সেইখানে এক কাঠুরে আর তার স্ত্রী বাস করতো। তারা ছিল নিঃসন্তান। তাই এই সুন্দরী মেয়েটিকে ও ফুট্‌-ফুটে ছেলেটিকে দেখে তাদের বড় লোভ হ'লো। তারা তখন কাঞ্চনমালাকে নিয়ে গিয়ে তাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিলে। কাঞ্চনমালা সেইখানে মনের সুখে বাস কর্‌তে লাগলো।

কাঠুরের বৌকে সে ডাক্‌তো মা ব'লে। জন্মাবধি কোন দিন সে মায়ের মুখ দেখেনি তাই তাকে পেয়ে সে মায়ের দুঃখ ভুল্‌লো। আর কাঠুরের স্ত্রীও মেয়ে কি জিনিষ জানতো না, তাই কাঞ্চনমালাকে পেয়ে পেটের মেয়ের মত ভালবাসতে লাগলো।

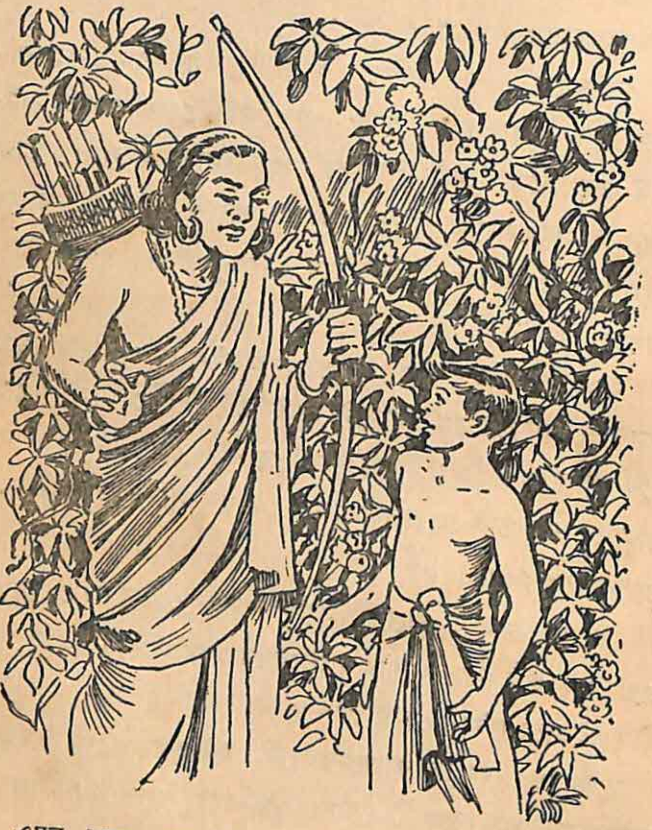
কাঞ্চন রোজ তাদের সঙ্গে বনে কাঠ কাট্‌তে যেতো এবং সেই কাঠ নিয়ে আবার বাজারে বেচে আসতো।

এইভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাঞ্চনের স্বামী হৃষ্ট-পুষ্ট হ'য়ে উঠলো। রাজপুত্রের মত তার চেহারা। কাঠুরেরা তার নাম রাখলে ফুলকুমার!

ফুলকুমার ছুটোছুটী করে, অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সেখানে খেলা করে।

তাকে বাড়ী রেখে একদিন কাঞ্চন কাঠুরেদের সঙ্গে কাছাকাছি একবনে গেল কাঠ কাটতে।



এমন সময় একরাজা এক হরিণ শিকার করবার জন্য তার পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে একেবারে এসে পড়লো সেই বনে। ফুলকুমারকে দেখে তিনি তার পানে এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে

চেয়ে রইলেন যে, শিকার ওদিকে গেল পালিয়ে। এই বিজন বনের মধ্যে এমন ফুট্‌ফুটে রাজপুত্তুর কোথা থেকে এলো! এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি একেবারে ফুলকুমারের কাছে গিয়ে হাজির হ'লেন এবং তাকে ডেকে জিগ্যেস কর্‌লেন, "তোমার ঘর কোথায়?" ফুলকুমার সেই পাতার কুঁড়ে ঘর দেখিয়ে বললে, "ওই যে আমাদের বাড়ী!"

রাজার মনে কেমন অবিশ্বাস হ'লো। তিনি বল্‌লেন, "ও ত কাঠুরেদের ঘর!"

সে বল্‌লে, "আমরা যে কাঠুরে, ওইখানেই থাকি!" রাজা বল্‌লেন, "চলো দেখি তোমার বাড়ীতে আর কে আছে?" ফুলকুমার বললে, "আমাদের বাড়ীতে এখন কেউ নেই, সবাই কাঠ কাট্‌তে গেছে বনে। একটু পরে সকলে ফিরে আসবে।"

যেই সেই কথা শোনা অমনি রাজার মনে একবুদ্ধি খেলে গেল। তাঁর সঙ্গে লোক-লস্কর অনেক ছিলো। তিনি করলেন কি—ফুলকুমারকে জোর ক'রে ধ'রে বেঁধে একেবারে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে লম্বা পাড়ি দিলেন নিজের রাজ্যে।

সেখানে বিরাট্ অট্টালিকা, অগণিত দাসদাসী, বহুমূল্য আসবাব-পত্র দেখে ত ফুলকুমারের চক্ষুস্থির! রাজপ্রাসাদ, রাজ-ঐশ্বর্য্য যে কি জিনিষ ইতিপূর্ব্বে কখনো সে দেখেনি। তাই অবাক্ হ'য়ে সে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগলো।

রাজা তাকে ভালো ভালো পোষাক পরিয়ে, উৎকৃষ্ট রাজভোগ খাইয়ে রাজার ছেলের মত ক'রে মানুষ কর্‌তে লাগলেন।

এদিকে বন থেকে ফিরে এসে ফুলকুমারকে ঘরে দেখ্‌তে না পেয়ে কাঞ্চনমালা কেঁদে-কেটে অস্থির হ'লো। কাঠুরেরা তাকে অনেক বোঝালে, কিন্তু তবুও তার কান্না থাম্‌লো না। তাই পরদিন অতি প্রত্যুষে সেই কাঠুরে-পিতা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল ফুলকুমারের সন্ধানে।

কত মাঠ-ঘাট, নদী-পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে তারা চলতে লাগলো। কত গ্রাম, কত নগর, কত ছোট-বড় রাজ্য তারা অনুসন্ধান করলে ফুলকুমারের কিন্তু বৃথা। কেউ তার কথা বলতে পার্‌লে না।

এইভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ছ'বছর কেটে গেল।

শেষে একদিন তারা এসে পৌঁছলো সুমাই নগরে। সেখানকার রাজার নাম বিদ্যাধর। তাঁর একটি অতি সুন্দরী কন্যা আছে, তাঁর নাম কুঞ্জলতা।

সেই নগরে পৌঁছতেই কাঞ্চনমালার কানে গেল যে, সেইদিন সকালে রাজা বিদ্যাধর ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কন্যার জন্য একটি পরমা সুন্দরী দাসী চাই।

কাঞ্চনমালা তখন তার কাঠুরে-পিতাকে বললে, "আমার শরীর বড় খারাপ, আমি আর কোথাও যাবো না, এই রাজকন্যার দাসী হ'য়ে এইখানেই থাকবো।

অগত্যা কাঠুরে সেইখানে তাকে রেখে চ'লে গেল। রাজার লোকেরা কাঞ্চনমালাকে সঙ্গে ক'রে কুঞ্জলতার কাছে নিয়ে গেল।

রাজা-রাজড়ার কাণ্ড! যেমন তেমন দাসী-বাঁদী হ'লে ত চলবে

না ! তাই রাজকুমারী কুঞ্জলতা আবার ঘোষণা ক'রে দিয়েছিলেন তাঁর দাসীকে দেখতে কেমন হবে। সোনার মত রঙ, পদ্মের পাপড়ির মত টানা চোখ, মেঘের মত কালো চুল মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এসে পড়েছে !

কাঞ্চনমালার সঙ্গে এই বর্ণনার অনেক মিল আছে দেখে রাজার লোকেরা তাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে রাজকুমারীর কাছে।

কুঞ্জলতাও তাকে দেখে পচ্ছন্দ করলেন এবং তখনি কাঞ্চনমালার চাকরী মঞ্জুর হ'লো।

কাঞ্চনমালা জানতো না যে, ফুলকুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে কুঞ্জলতার। যে রাজা তাকে ধ'রে নিয়ে এসেছেন তিনি হ'লেন কুঞ্জলতার বাপ বিদ্যাধর।

তাই হঠাৎ যখন কাঞ্চনমালার সঙ্গে ফুলকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ হ'লো সেখানে, তারা দু'জনে দু'জনকেই দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হ'লো। কুঞ্জলতার দাসী কাঞ্চনমালা হ'লেও সেইদিন থেকে সে সেবা-যত্ন করতে লাগলো ফুলকুমারকে।

তার প্রতিটী ছোট-বড় কাজ কাঞ্চনমালা নিজহাতে ক'রে দিতে লাগলো এবং সে না করলে ফুলকুমারেরও ভালো লাগ্‌ত না।

এই দেখে কুঞ্জলতার মনে হিংসা হ'লো। তিনি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর মাকে গিয়ে সব কথা বললেন। কাঞ্চনমালাকে তখন ফুলকুমারের চোখের সামনে থেকে কি ভাবে সরিয়ে

দেওয়া যায় এই কথা তাঁরা মায়ে-ঝিয়ে চিন্তা কর্তে লাগলেন।

এদিকে যতদিন যেতে লাগলো ফুলকুমারও তত বিরক্ত হ'তে লাগলো কুঞ্জলতার ওপর। কোন কাজ কুঞ্জলতা করলে তার ভাল লাগে না। বলে, "কাঞ্চনমালাকে ডেকে দাও, সে করুক।"

কুঞ্জলতা শুধু কাঁদে। ফুলকুমারের ভয়ে কাঞ্চনমালাকে কিছু বল্‌তে পারে না।

এমন সময় একদিন বহুলোকজন নিয়ে ফুলকুমার শিকার করতে গেল, দূরে কোন জঙ্গলে। যেতে আসতে দু'মাসের পথ।

এদিকে দু'মাসের মধ্যে রাজ্যে নানা অঘটন ঘট্‌লো।

বৃদ্ধরাজা বিদ্যাধর একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। রাজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও পুরানো হাতীটাও মরে গেল কয়েকদিন পরে। তা'ছাড়া, আরো অনেক ছোট-বড় অশান্তি দেখা দিল রাজ্যে।

রাজার শোকে সবাই মুহ্যমান হ'য়ে পড়্‌লো। কুঞ্জলতার ও কান্না আর থামে না।

এই সুযোগে কুঞ্জলতা ও রাণীমা রটিয়ে দিলেন যে, কাঞ্চনমালা ডাইনী। তারি জন্যে এত অশান্তি ঘট্‌ছে রাজ্যে।

প্রজারাও সব তাই বিশ্বাস করলে। এদিকে দু'মাস কেটে গেল। ফুলকুমার ফিরে এসে রাজা হ'লো। কিন্তু

বিদ্যাধরের শোকে সর্ব্বদা তার মন আচ্ছন্ন হ'য়ে থাক্‌তো। বৃদ্ধ রাজা তাকে পুত্রের মত ভালবাসতেন।

প্রজারা সকলে তখন একসঙ্গে ফুলকুমারকে গিয়ে বল্‌লে, “কাঞ্চনমালা ডাইনী, তারই জন্যে রাজ্যে যত অশান্তি, এখুনি তাকে দূর ক'রে দিন।”

ফুলকুমার তাদের কথা বিশ্বাস কর্‌লে না। হেসে উড়িয়ে দিলে।

তখন ঘুস দিয়ে কতকগুলো লোককে কুঞ্জলতা বশ কর্‌লেন। তারা রাত্রে রাজার সেরা ঘোড়াকে ঘোড়াশালা থেকে চুরি ক'রে হত্যা কর্‌লে এবং তার রক্ত কাঞ্চনমালার বিছানায়, ঘরে-দোরে ছড়িয়ে দিয়ে পালালো।

পরদিন সকালে ফুলকুমারকে কাঞ্চনমালার ঘরে নিয়ে গিয়ে সবাই দেখালে সে-দৃশ্য। তখন রাজার মনে আর দ্বিধা রইল না। কাঞ্চনমালা যে ডাইনী, এ-কথা প্রমাণ হ'য়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ ফুলকুমার সেই ডাইনীকে বহুদূরে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে নির্ব্বাসন দেবার হুকুম দিলে।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কাঞ্চনমালা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

কুঞ্জলতা তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তাঁর মুখে আবার হাসি ফুট্‌লো।

কিন্তু কাঞ্চনমালা যেদিন রাজ্য ছেড়ে চলে গেল, সেদিন থেকে ফুলকুমারের মনে অশান্তি দেখা দিল। কোন কাজে তার মন লাগে না। শুধু নির্জ্জনে বসে বসে কাঁদে আর কি ভাবে!

এদিকে বনের মধ্যে কাঞ্চনমালার কেঁদে কেঁদে দিন কাট্‌তে লাগল। ঘোর অরণ্য—তার চারদিকে পাহাড়-পর্ব্বত! কোন্ দিকে যাবে, কোন পথ চেনে না। তাই বন-জঙ্গল ও কাঁটার মধ্যে দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ একদিন তার মনে পড়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর কথা! এইভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

খুঁজতে খুঁজতে শেষে বহুদিন পরে কাঞ্চনমালা একটা বনের মধ্যে এসে সেই বটগাছটাকে দেখতে পেলে এবং তার তলায় বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগল।

গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে আবার সন্ন্যাসী তার সামনে দাঁড়ালেন।

কাঞ্চনমালা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে একে একে সব দুর্ভাগ্যের কথা তাঁকে বল্‌লে।

সন্ন্যাসী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই গাছের কোটরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখলেন এবং ব'লে দিলেন, তিনদিন যেন সে কোন মতেই আর গাছের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে না আসে। এই ব'লে কতকগুলো ফলমূল তাকে দিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

সারারাত সারাদিন ধ'রে সেই বনের মধ্যে ঠক্ ঠক্ ক'রে কিসের শব্দ হয়। তরু-কোটর ভেদ ক'রে তা কাঞ্চনমালার কানে যায়। আতঙ্কে সে শিউরে ওঠে। বাইরের দিকে চাইতে সাহস হয় না। সে ভাবে, এইজন্যেই বোধ হয় সন্ন্যাসী তাকে বাইরে আস্‌তে বারণ করেছিলেন!

যাই হোক, তিনদিন পরে সন্ন্যাসী আবার সেখানে এসে দেখা দিলেন এবং কাঞ্চনমালাকে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে আদেশ দিলেন।

কাঞ্চনমালা বাইরে এসে অবাক্ হ'য়ে গেল। চারদিকে বিরাট বিরাট অট্টালিকা! কত ঘর, কত দোর, কত তোরণ তার ঠিক নেই। ফুলকুমারের প্রাসাদ এর কাছে তুচ্ছ!

বিস্ময়াবিষ্টের মত কাঞ্চনমালা সন্ন্যাসীকে জিগ্যেস্ কর্‌লে, "এ প্রাসাদ কোন্ রাজার এবং কেমন ক'রেই বা এখানে এলো।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "এ তোমার প্রাসাদ মা, আজ থেকে তুমি এখানে থাক্‌বে। ঈশ্বরের কৃপায় তুমি একে লাভ করেছো।"

কাঞ্চনমালা তখন সেই প্রাসাদে বাস কর্‌তে লাগলো।

এদিকে সন্ন্যাসী দেশ-বিদেশে ঘোষণা ক'রে দিলেন যে, এই বনে এক রাজকুমারী বাস করেন। তিনি একটা গান জানেন। আধখানা গান তিনি গাইবেন আর বাকী আধখানা যে রাজপুত্তুর গাইতে পার্‌বেন, তিনি তাঁরই গলায় মালা দিবেন।

এই সংবাদ পেয়ে দেশ-বিদেশ থেকে বহু রাজকুমার ছুটে এলেন। কিন্তু কাঞ্চনমালা যখন তার জীবনের ইতিহাস অর্দ্ধেকটা গেয়ে থেমে যায়, তখন বাকী অর্দ্ধেকটা আর কেউ শেষ কর্‌তে পারেন না। তখন অপমানে সবাই নতমুখ হ'য়ে চলে যান।

একদিন হ'লো কি, কাঞ্চনমালা অর্দ্ধেকটা গান গেয়ে যেই

থেমেছে, অমনি একটা অন্ধ ভিখিরী তার বাকী অর্দ্ধেকটা গাইতে গাইতে একেবারে রাজসভার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লো।

কাঞ্চনমালা তখন ছুটে গিয়ে তার গলায় মালা দিলে।

অন্যান্য রাজপুত্ররা সবাই ক্ষেপে গেলেন। বল্‌লেন, "ও ত ভিখিরী—রাজকুমার নয়। ওর সঙ্গে কেমন ক'রে বিয়ে হবে?"

কাঞ্চনমালা তখন ইন্দ্রাণীর মত দাঁড়িয়ে ওঠে বল্‌লে, "এই অন্ধ ভিখিরী—রাজা ফুলকুমার!"

রাজা ফুলকুমারের নাম শুনে সবাই চমকে উঠলেন এবং ভাল ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন—হ্যাঁ, ফুলকুমারই ত বটে! তখন চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। অন্যান্য রাজপুত্ররা যে যাঁর রাজ্যে ফিরে গেলেন।

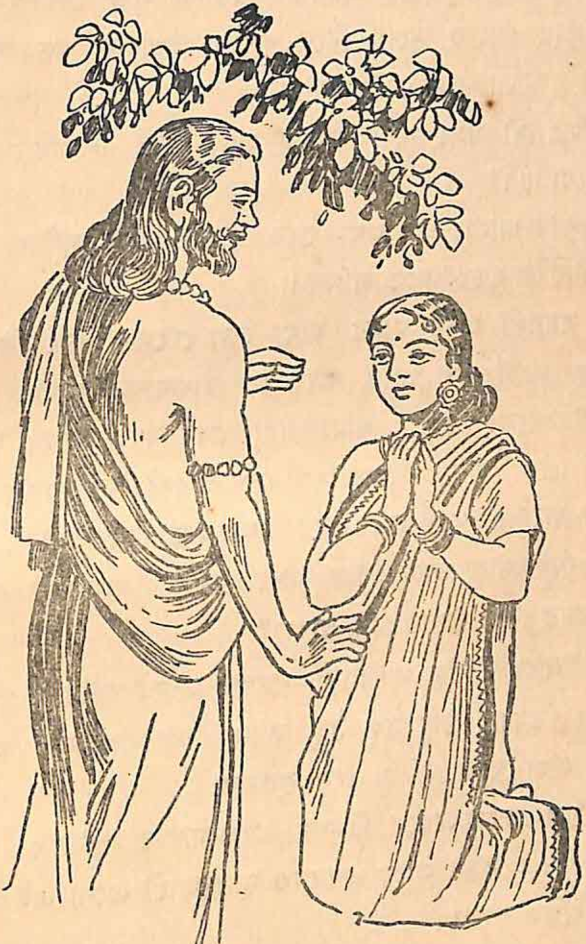
কাঞ্চনমালা অন্ধ স্বামীর পদসেবা করতে লাগল সেই রাজ-প্রাসাদের মধ্যে থেকে। এইভাবে প্রায় এক বছর কেটে গেল।

একদিন কাঞ্চনমালা ফুলকুমারকে জিগ্যেস্ কর্‌লে, "কেমন ক'রে তোমার সুন্দর চোখ দু'টির এই অবস্থা হ'লো।"

ফুলকুমার বল্‌লে, "শুধু তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ অন্ধ হ'য়ে গেছে।"

এই কথা শুনে কাঞ্চনমালার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগল। সে তখন ছুটে সেই বনের মধ্যে চলে গেল এবং সেই বটগাছটার তলায় বসে কাঁদ্‌তে লাগল।

সন্ন্যাসী গাছ থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, "রাজকুমারী, তুমি কি চাও, আবার কাঁদ্‌ছ কেন?"



সন্ন্যাসী গাছ থেকে......আবার কাঁদ্‌ছ কেন ?"

কাঞ্চনমালার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বহুদিন পরে দেখা হ'লো। সে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লে, "আমার অন্ধ স্বামীর চোখ ছু'টি ভালো ক'রে দিন।"

সন্ন্যাসী বল্‌লেন, "একবার ভাল ক'রে দিয়েছি; আর পার্‌বো না।"

কাঞ্চনমালা এই কথা শুনে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে ভিখারিণীর মত কাঁদ্‌তে লাগল।

সন্ন্যাসী তখন বনের মধ্যে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে একটা ফল হাতে ক'রে এসে কাঞ্চনকে বল্‌লেন, "এই ফলটা খেলেই তোমার স্বামী আবার চোখ ফিরে পাবে। কিন্তু সেই চোখে যেদিন তোমার মুখ দেখবে, সেইদিনই আবার অন্ধ হ'য়ে যাবে। আর কোন জন্মে এ অন্ধত্ব তার ঘুচবে না।"

কাঞ্চনমালা তখন আরো কাঁদ্‌তে লাগল। বল্‌লে, "এ-ছাড়া কি আর কোন উপায় নেই, প্রভু!"

"আছে।" ব'লে সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ সেই গাছের গোড়ায় গিয়ে তিনবার ঠক্ ঠক্ ঠক্ ক'রে টোকা মার্‌লেন। অমনি তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো কুঞ্জলতা।

কুঞ্জলতাকে দেখে হিংসায় কাঞ্চনমালার ছ'চোখ জ্বলে উঠলো। কেমন ক'রে এখানেও রাজকুমারী এলো এই ভেবে সে বিস্মিত হ'লো।

সন্ন্যাসী তখন সেই ফলটা কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, "এইটা যদি তুমি স্বামীর কল্যাণ কামনা ক'রে সরল

অন্তঃকরণে কুঞ্জলতার হাতে দিতে পারো ত কুঞ্জলতা খেলেই তোমার স্বামী চক্ষুষ্মান হ'বে। কিন্তু তোমাকে দেখলেই অন্ধ হ'য়ে যাবে। এখন তোমার যা ইচ্ছা হয় করো।"

এই ব'লে তিনি সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্ত্রীর নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত, এই মনে ক'রে সরল ও সুস্থ মনে কাঞ্চনমালা সেই ফলটি কুঞ্জলতার হাতে তুলে দিয়ে চিরকালের মত সেই দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেল, তা কেউ জানে না।

এদিকে কুঞ্জলতা সেই ফলটি খেতেই ফুলকুমার চক্ষুষ্মান হ'য়ে উঠলো। কিন্তু কাঞ্চনমালা কৈ ?

চোখ খুলেই সে দেখলে কুঞ্জলতাকে।

তখন মিথ্যা ক'রে কুঞ্জলতা বল্‌লে, "সে রাক্ষসীর জন্যেই ত তুমি অন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলে এবং তোমাকে অন্ধ অবস্থায় রেখে সে পালিয়ে গেছে। আমি অনেক ব্রত উপবাস ক'রে, অনেক ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে এই ফলটি পেয়েছি এবং তাই খেয়েই তোমার চোখ দু'টি আবার ফিরিয়ে এনেছি। সে ডাইনীর নাম আর মুখে এনো না।"

ফুলকুমার সেই ফলটার খোসা দেখে ভাবলে, কথাটা সত্যিই। তাই আর কাঞ্চনমালার নাম মুখে না এনে সুখে ও শান্তিতে কুঞ্জলতাকে নিয়ে দিন কাটাতে লাগল।

দস্যু কেনারাম



অনেক পূজো মানসিক ক'রে, অনেক ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়ে শেষে দ্বিজ ফেলারাম এক সন্তান লাভ কর্‌লেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর মুখে হাসি ফুট্‌লো। এতদিন তাঁরা ছিলেন ভারী মনোকষ্টে। সমাজে মুখ দেখাতে তাঁদের মাথা কাটা যেতো—সবাই ঘৃণা কর্‌তো আঁটকুড়ো ব'লে। তাই বহুদিন পরে এই পুত্র লাভ ক'রে আনন্দে তাঁরা উচ্ছ্বসিত

হ'য়ে উঠলেন। তাঁদের আঁধার ঘরে এতদিন পরে যেন আলো জ্বল্লো!

চাঁদের মত ছেলেটিকে দেখে মা ও বাপের মনে আর সুখ ধরে না। ছ'মাস বয়েস হ'তেই তাঁরা খুব ধুমধাম ক'রে ত তার অন্নপ্রাশন দিলেন এবং পুত্রের নাম রাখলেন, কেনারাম।

কিন্তু এ সুখ তাঁদের কপালে বেশীদিন টিকল না। অন্ন-প্রাশনের এক মাস পরেই কেনারামের মা মারা গেল। বেচারী ফেলারাম তখন মহা ফ্যাসাদে পড়লেন! স্ত্রীর জন্যে শোক কর্‌বেন, না মাতৃহীন শিশুটিকে রক্ষণাবেক্ষণ কর্‌বেন!

কে কাকে ছ্যাখে?

ব্রাহ্মণ একলা, স্ত্রী ছাড়া তাঁর সংসারে আর কেউ ছিল না। তার ওপর টাকাকড়িরও বিশেষ স্বচ্ছলতা ছিল না। যজমানদের বাড়ী পূজো-পার্ব্বণ, ক্রিয়াকলাপে যা পেতেন, তাইতেই সারা বছর কোন রকমে খেয়েপরে কেটে যেতো।

তাই ছেলেটিকে মানুষ কর্‌বার অন্য কোন উপায় না দেখতে পেয়ে একদিন তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে শিশুটিকে বুকে ক'রে গিয়ে হাজির হ'লেন তাঁর শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ কেনারামের মামার বাড়ী। কেনারামকে সেখানে রেখে তিনি চলে গেলেন দিনকতকের জন্যে তীর্থ-ভ্রমণে!

মামা-মামীর আদরে কেনারাম রইল মামার বাড়ী। সেখানকার অবস্থা মন্দ নয়। জমি-জমা, ক্ষেত-খামার তাঁদের যা আছে, তাতে ক'রে সারা বছর খেয়েপরেও কিছু উদ্বৃত্ত হয়। তাই

যত দিন যেতে লাগল, ততই কেনারামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হ'তে লাগল।

এদিকে কেনারামের বাবাকে নিয়ে হ'লো মুস্কিল! কয়েক দিনের জন্যে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে কয়েক মাস কেটে গেল, তবুও তিনি ফিরে এলেন না—এমন কি কোন খবর পর্য্যন্ত তাঁর পাওয়া গেল না। কেনারামের মামা গ্রামের যে লোক যখন তীর্থে যায়, সবাইকে বিশেষ ক'রে ব'লে দেন, তাঁর ভগ্নিপতি কেলারামের খোঁজ কর্তে কিন্তু কেউ-ই সুবিধে কর্তে পারে না। ফিরে এসে বলে, ও-নামে কোন লোক নেই সেখানে! ভয়ে কেনারামের মামার মুখ শুকিয়ে গেল—বুঝি ভাগ্নেটার ভার চিরজীবনের মত তাঁর স্কন্ধে পড়্‌লো!

এইভাবে দেখতে দেখতে ছ'বছর কেটে গেল।

এমন সময় গ্রামে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। চারদিকে হাহাকার পড়ে গেল। পর পর দু'বছর অজন্মা—মাঠ ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে। কারো ঘরে ধানচাল নেই। যে যার হাল, গরু, বলদ বিক্রী ক'রে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল। থালা-বাসন, গরু-ছাগল, এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত জলের দামে বিক্রী হ'তে লাগল। স্ত্রী-পুত্রও বাদ গেল না। লোকে তা-ও বিক্রী কর্‌তে লাগল পেটের দায়ে।

কেনারামের মামা বহুদিন অনাহারে থেকেও নিজেকে সামলাতে পার্‌লেন না। শেষে একদিন এক ডাকাতের কাছে কেনারামকে বিক্রী ক'রে দিয়ে কিছু চাল সংগ্রহ কর্‌লেন। আবার বহুদিন পরে তাঁদের পেটে দু'টি ভাত পড়্‌লো।

তারপর কোথায় রইল কেনারাম আর কোথায় তার মামা ?

ডাকাতরা তাকে নিয়ে চলে গেল কোন অজানা দেশে। বন-জঙ্গল ও পাহাড়-ঘেরা এক অন্ধকার স্থান—তারই মধ্যে তারা কেনারামকে নিয়ে গিয়ে রাখলে এবং লাঠি, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতে লাগল।

এমনি ক'রে আরো দশ বছর কেটে যাবার পর কেনারাম রীতিমত ডাকাত হ'য়ে উঠলো। ব্রাহ্মণের ছেলে তার সহজাত দয়ামায়া সব ভুলে গিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে থেকে থেকে নির্ম্মম নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠলো।

ষোল বছরের যুবক সে। মনে তার অগাধ সাহস, দেহে অপরিমিত ক্ষমতা! লোককে মেরে ধরে, ছিনিয়ে সে জিনিষ-পত্তর লুঠ ক'রে আনে। হাসিমুখে মানুষের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। কেনারামের নামে লোকে ভয়ে শিউরে ওঠে।

তারা আট-দশজন মিলে বনের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে। পথিক দেখলেই ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরে এবং তার যা থাকে ছিনিয়ে নেয়। এই হ'লো তাদের পেশা।

এইভাবে যত দিন যেতে লাগল, কেনারাম তত ভীষণ হ'য়ে উঠতে লাগল। সে হ'লো দলের সর্দ্দার! তার অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো সবাই। কেনারামের নাম শুন্‌লে আতঙ্কে লোকের বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করে।

দেশ-বিদেশে যেতে হ'লে লোকে কেঁদে অস্থির হয়। কোন্ পথে যে ডাকাত কেনারাম তাদের আক্রমণ কর্‌বে,

তার ঠিক-ঠিকানা নেই! সন্ধ্যা হ'লে আর কেউ বাড়ী থেকে বেরোয় না।

এদিকে হ'লো কি, কেনারামের বাবা ফেলারাম তীর্থে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশে সাধু হ'য়ে গেলেন। সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা, ধর্ম্মচিন্তা ও পবিত্র জীবন-যাপন কর্‌তে কর্‌তে তিনিও হ'য়ে উঠলেন অতি ধার্ম্মিক পুরুষ। লোকে তাঁর নাম দিল দ্বিজবংশী। ঠাকুর-দেবতার নামগান এমন প্রাণ ঢেলে তিনি কর্‌তেন যে, যে শুন্‌তো তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তো। অতি-বড় নিষ্ঠুর যে, তারও প্রাণ গলে যেতো। এমন ভাব, এমন দরদ দিয়ে তিনি নাম-সংকীর্ত্তন কর্‌তেন যে, দূর-দূরান্তর থেকে লোকে আস্‌তো তাঁর মধুর কণ্ঠে শ্রীভগবানের সেই নাম শুন্‌তে। এইভাবে বহু ভক্তশিষ্য তাঁর জুটে গেল এবং দেখতে দেখতে দ্বিজবংশীর নাম ছড়িয়ে পড়লো দেশ-বিদেশে।

দলবল নিয়ে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন গাইতে গাইতে তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রামে গ্রামে। যে শোনে সে-ই মুগ্ধ হয়।

এইভাবে একদিন দ্বিজবংশী একটা বন পেরিয়ে দূর গাঁয়ে যাচ্ছেন। সন্ধ্যার আর বিশেষ দেরী নেই। সঙ্গে ভক্তবৃন্দ খোল-করতাল বাজাতে বাজাতে চলেছেন—মাঝখানে তিনি মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন গাইছেন। এমন সময় রে-রে-রে-রে কর্‌তে কর্‌তে তাঁদের এসে ঘিরে দাঁড়াল দস্যু কেনারাম তার

দলবল নিয়ে। সকলের হাতে ধারালো খাঁড়া, লাঠি-সড়কী, আরো কত রকমের অস্ত্র! কেনারাম গম্ভীরকণ্ঠে বল্‌লে, "কি আছে শীগ্‌গির দে—নয় ত এখুনি এই খাঁড়া দিয়ে মুণ্ডু কেটে ফেল্‌বো।"

ঠাকুর বংশী বল্‌লেন, "বাবা, আমরা গরীব ব্রাহ্মণ, ঠাকুরদের নামকীর্ত্তন ক'রে ভিক্ষা করি। তোমাদের কি দেবো—আমাদের কাছে ত কিছু নেই!"

এই কথা শুনে কেনারাম জ্বলে উঠলো। খাঁড়া মাথার উপর তুলে ধরে বল্‌লে, "আর এক মুহূর্ত্ত দেরী কর্‌লে কেটে ফেল্‌বো।"

ব্রাহ্মণ বল্‌লেন, "ব্রহ্মহত্যা ক'রে কেন মিছিমিছি অনন্ত নরকভোগের পাপ কর্‌বে। তোমার প্রয়োজন টাকাকড়িতে, আমাদের কাছে যখন কিছুই নেই, তখন মানুষকে হত্যা ক'রে কি ফল হবে বলো!"

কেনারাম হেসে বল্‌লে, "সদুপদেশ দিয়ে আমাকে ভোলাতে পার্‌বে না। পাপের ভয় আমার নেই! হাজার হাজার মানুষ এই হাতে আমি হত্যা করেছি। কত মা পায়ে ধরে সন্তানের জীবন ভিক্ষা চেয়েছে, কত নারী তার স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে চোখের জলে আমার পা ধুইয়ে দিয়েছে, তবুও কেউ আমার প্রতিজ্ঞা একবিন্দু টলাতে পারেনি। দস্যু কেনারাম অত সহজে ভোলে না, বুঝেছ ঠাকুর?"

কেনারামের নাম শুনে শিষ্যদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো।

তারা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে সভয়ে তাকাল কিন্তু ঠাকুর বংশী এতটুকু ভয় পেলেন না। শান্ত সংযতভাবে তিনি তখনো তাকে হিতোপদেশ দিতে লাগলেন। বল্‌লেন, "আমাকে মেরে তোমার কি লাভ হবে! বরং তোমার পাপের বোঝা তাতে আরো বাড়বে। আজ যে টাকাকড়ির লোভে তুমি এই নরহত্যা কর্‌ছো, কাল যখন মৃত্যু এসে তোমার শিয়রে দাঁড়াবে তখন কি এই টাকাকড়ির কোন-কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌বে? কোথায় থাক্‌বে তখন তোমার ধনদৌলত, কে ভোগ কর্‌বে? তবে কার জন্যে এই পাপকার্য্য কর্‌ছো। একবার ভেবে দেখো ভালো ক'রে—তুমিও মানুষ, তোমারও মানুষের মত প্রাণ আছে। ইচ্ছা কর্‌লেই তুমি মানুষকে প্রাণ দান কর্‌তে পারো—তাদের ভালো কর্‌তে পারো!"

তখন কেনারাম বল্‌লে, "খুব ত বক্তৃতা দিলে। একবার তোমার নামটা কি বলো ত, ঠাকুর!"

ঠাকুর বল্‌লেন, "দ্বিজবংশী।"

এই নাম শুনেই কেনারামের বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি কি সেই দ্বিজবংশী, যার নামগান শুনে পাষাণও গলে জল হ'য়ে যায়?"

ঠাকুর বল্‌লেন, "হ্যাঁ। কিন্তু তোমার মত মানুষের প্রাণ গলাতে পার্‌লুম না, এই বড় দুঃখ।"

বাপ ও ছেলে—কেউ কাউকে চেনে না। বহু বছর আগে হ'য়েছে তাদের বিচ্ছেদ! আজ কালের গতিতে তাই একজন

দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত আর একজন সাধু। একজন মানুষের প্রাণ সংহার করে, আর একজন তা থেকে তাকে নিবৃত্তি করে।

কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে এবং অনেক দেরী হ'য়ে গেল দেখে তখন কেনারাম সঙ্গীদের ইসারা কর্‌লে। তারা তৎক্ষণাৎ খাঁড়া উঁচু ক'রে তাদের গর্দ্দানের উপর ধর্‌লো।

ঠাকুর বংশী তখন কেনারামকে বল্‌লেন, "যখন মর্‌তেই হবে তখন আমায় একবার ঠাকুরের নামকীর্ত্তন ক'রে নিতে দাও।"

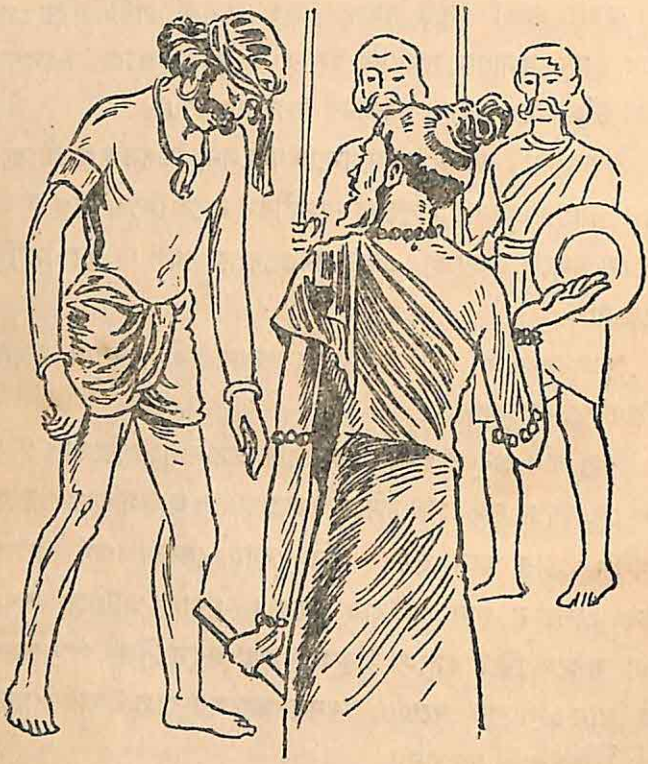
সে বল্‌লে, "আচ্ছা, একটু সময় দেওয়া গেল। তাড়াতাড়ি সেরে নাও।"

খোল-করতাল বাজিয়ে ঠাকুর তখন দেবী মনসার বন্দনা গাইতে সুরু কর্‌লেন।

কিন্তু গান শুন্‌তে শুন্‌তে কেনারাম এমনিভাবে বিভোর হ'য়ে গেল যে, তার দুই চোখ দিয়ে অজস্রধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মনে হ'লো বুঝি কোন দেবতা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন গান গাইবার জন্যে। মশাল জ্বালিয়ে তখন তারা সকলে ঘিরে বস্‌লো ঠাকুরকে এবং হুকুম দিলে অনেকক্ষণ ধরে গান চালাবার জন্যে। 'মনসা-মঙ্গলের পালা' আগাগোড়া তখন ঠাকুর বংশী ধর্‌লেন!

গান শুন্‌তে শুন্‌তে সারারাত কেটে গেল। 'বেহুলার ভাসান' যখন শেষ হ'য়ে গেল, তখন ভোরের আলো এসে পড়েছে অরণ্যের বুকে। হাতের খাঁড়াখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একেবারে কেনারাম দ্বিজবংশীর চরণে লুটিয়ে পড়লো এবং

বল্‌লে, "তুমি আজ থেকে আমার গুরু। এমন গান আমি জীবনে কখনও শুনিনি। আমার মত কঠিন হৃদয়কেও তুমি



আজ গলিয়ে দিলে! তুমি ভগবান্! আমার যা-কিছু আছে আজ থেকে সব তোমার!"

এই ব'লে সে বনের মধ্যে থেকে সাত ঘড়া মোহর এনে তাঁর সামনে রাখলে।

দ্বিজবংশী বল্‌লেন, "আমি যে ধন পেয়েছি, তোমার এই ধনরত্ন তার কাছে তুচ্ছ। তা'ছাড়া তোমার এই পাপের উপার্জ্জন ছুঁলে আমার পাপ হবে। এ আমি চাই না। আমি গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবো—এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিলাষ!"

কেনারাম তখন তাঁর পায়ে ধরে বল্‌লে, "প্রভু, রাগ কর্‌বেন না। আমি অজ্ঞান—কিছু জানি না, তাই এ কাজ করেছি। ছেলেবেলা থেকে কেউ কোনদিন আমায় ভাল শিক্ষা দেয়নি, ভাল কথা বলেনি। তাই এই পাপকার্য্যই ভালো ব'লে মনে কর্‌তুম। আজ আপনার কথায় আমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে।"

এই ব'লে একে একে সে তার সারাজীবনের উপার্জ্জন সাত ঘড়া মোহর নদীর জলে ঢেলে ফেলে দিলে।

তখন ব্রাহ্মণ ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লেন এবং বল্‌লেন, "আজ থেকে তুমি আমার শিষ্য!"

তারপর তাঁদের সঙ্গে গান গাইতে গাইতে কেনারাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে লাগল।

এইভাবে দস্যু কেনারাম ডাকাতি ছেড়ে ধর্‌লে ভিক্ষাবৃত্তি। যে কেনারামের নাম শুনে একদিন লোক আতঙ্কে শিউরে উঠতো, সেই কেনারামের গান শুনে এখন লোকে চোখের জলে ভেসে যায়।

রূপবতী রাজকন্যা

এক রাজা—তাঁর নাম রাজচন্দ্র। তিনি রাজত্ব কর্‌তেন রামপুর শহরে। ফুলেশ্বরী নদীর ধারে মস্ত বড় এই রাজ্য। হাতী, ঘোড়া, দাসদাসী, অট্টালিকা, ধন, ঐশ্বর্য্য তাঁর প্রচুর—অভাব ছিল না কিছুরই।

একদিন রাজা রাজসভায় বসে আছেন পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হ'য়ে, এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল—বহুদিন নবাবের কোন খবর পাওয়া যায়নি, অবিলম্বে তাঁর নিজের সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।

এই নবাবের অধীনেই ছিল এই রকম আরো অনেক ছোট-বড় রাজ্য। সবাই খাজনা দিত নবাবকে, তিনি ছিলেন সকলের শ্রেষ্ঠ। কাজেই সেখানকার রাজারা মাঝে মাঝে নবাবের কাছে গিয়ে সশরীরে হাজির হ'তেন এবং নানাভাবে তাঁকে পরিতুষ্ট কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন।

নবাব বাদশার মেজাজ! এই একরকম আছে, পরক্ষণেই হয়ত গেল বদলে। কখন কার প্রতি বিরূপ হয়, বলা যায় না। তাই সময়ে অসময়ে যে যখন পার্‌তো ছুটে গিয়ে হাজির হ'তো নবাবসমীপে।

কথাটা মনে পড়তেই তাই রাজা রাজচন্দ্র অবিলম্বে রাজ-জ্যোতিষকে ডেকে পাঠালেন এবং দিনক্ষণ কবে ভাল আছে গণনা ক'রে দেখতে আদেশ কর্‌লেন।

দিনস্থির হ'লো।

রাজা রাজচন্দ্র তাঁর রাজ্যের যা-কিছু ভাল ভাল জিনিষ সব সংগ্রহ কর্‌লেন নবাবকে ভেট দেবার জন্যে। তারপর সঙ্গে নিলেন এক হাজার মোহর—রাজস্ব-স্বরূপ।

ঘাটে বাঁধা ছিল এক বিরাট ময়ূরপঙ্খী—লোকলস্কর, সেনা-সামন্ত নিয়ে রাজা গিয়ে তাতে উঠলেন। একশত দাঁড় বাইতে বাইতে নৌকো চল্‌লো।

নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ। বহু নদ-নদী পেরিয়ে প্রায় তিন মাস পরে রাজা রাজচন্দ্র সেখানে গিয়ে হাজির হ'লেন।

নবাব নিজে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা কর্‌লেন। হিন্দুরাজাদের জন্যে যে-সব প্রাসাদ প্রস্তুত ছিল, তারই মধ্যে যেটি সকলের চেয়ে সুন্দর তাতে রাজা রাজচন্দ্রের থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তা-ছাড়া সেনা'-সামন্ত, লোকজন, দাঁড়িমাঝিদের জন্যে সুন্দর সুন্দর ছাউনি ফেল্‌লেন সেই প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে।

তারপর নবাবের দাসদাসী, ব্রাহ্মণ-পাচকরা সব ছুটোছুটি কর্‌তে লাগল তাদের সেবাযত্নের জন্যে। নবাবোচিত আদর-যত্নের মধ্যে তাঁরা রইলেন নবাবের অতিথি হ'য়ে।

নবাবের সঙ্গে রাজা আজ ভোজ খান, কাল নৃত্যগীতের মজলিসে রাত কাটান, পরশু হাতীঘোড়া নিয়ে শিকারে যান, তার পরের দিন হয়ত দেশ-ভ্রমণে বাহির হন—এইভাবে তাঁর দিন কাট্‌তে লাগল। নবাব নিজে এই মনোযোগ দেওয়াতে

রাজা রাজচন্দ্র অত্যন্ত খুশী হ'য়ে উঠলেন এবং এই সৌভাগ্যের জন্যে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করলেন।

এদিকে এক মাস দু'মাস ক'রে এক বছর কেটে গেল। ক্রমে এক বছর থেকে প্রায় দু'বছর কেটে যাবার জোগাড় হ'লো। রাজা নবাবী আদব-কায়দা ও খাতির-যত্ন উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে এমন উন্মত্ত হ'য়ে উঠলেন যে, নিজের রাজ্যের কথা, নিজের ঘর-বাড়ীর কথা একেবারে ভুলে বসে রইলেন।

রাণী দেখলেন মহামুস্কিল! রাজা ত রাজ্যে ফের্‌বার নাম করেন না। তা'ছাড়া ঘরে তাঁর বিবাহযোগ্যা মেয়ে—বিয়েরও তার কোন চেষ্টা হচ্ছে না। এদিকে রাজ্যের লোকেরা ছিঃ ছিঃ কর্‌ছে এতবড় মেয়ের বিয়ে হয়নি ব'লে। চোদ্দ পূর্ণ হ'য়ে মেয়ে পনেরো বছরে পড়লো, কি হবে! এই ভাবতে ভাবতে শেষে রাণী একখানি চিঠিতে সবিস্তারে সব লিখে একজন লোক পাঠালেন রাজার কাছে।

চিঠি পেয়েই রাজার হুঁস হ'লো। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবকে গিয়ে বল্‌লেন, "কালই দেশে রওনা হবো।"

নবাব বল্‌লেন, "আর দিনকতক থেকে যাও।"

রাজা বল্‌লেন, "আর একদিনও থাক্‌বার উপায় নেই। মেয়ে পনেরো বছরে পড়েছে, তার বিয়ের একটা ব্যবস্থা শীগ্‌গির কর্‌তে না পার্‌লে লোকে নিন্দে কর্‌ছে!"

নবাব বল্‌লেন, "তোমার মেয়েকে আমি বিয়ে কর্‌বো, কোন ভয় নেই। ধন ঐশ্বর্য্য তুমি যত চাও, আমার ভাণ্ডার

উন্মুক্ত ক'রে তোমায় দেবো। আরো রাজ্য দেবো, আরো দেশ দেবো—তুমি যা চাও তাই দেবো। তা'ছাড়া তোমার



সম্মান কত বেড়ে যাবে—তুমি হবে আমার শ্বশুর! রাজ্যের সমস্ত নৃপতি তোমায় সেলাম করবে! এমন কি, আমিও

সেলাম কর্‌বো। যাও, তুমি দেশে গিয়ে বিয়ের জোগাড় করো ; আমি কয়েক দিন পরেই রওনা হচ্ছি।"

নবাবের আদেশ অমান্য কর্‌বার শক্তি তখন বাংলাদেশে আর কারো ছিল না। তাই ভয়ে রাজা রাজচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল! মুসলমানের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়ে অসম্ভব! তাতে ধর্ম্ম যাবে—জাত যাবে! কিন্তু নবাবের মুখের ওপর কি ক'রে বল্‌বেন ; তাই শুষ্কমুখে দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় ক'রে তিনি ফিরে এলেন নিজের রাজ্যে।

রাজার মুখ দেখে ভয়ে রাণীর বুক কেঁপে উঠলো। তিনি তখন রাজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কি হ'য়েছে? রাজা কোন কথা গোপন না ক'রে রাণীকে সব খুলে বল্‌লেন।

এই কথা শুনে রাণী কাঁদ্‌তে লাগলেন। রাজা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে বল্‌লেন, "তুমি চুপ করো রাণী। আমি ত নবাবের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি না, তবে কেন এত কাঁদ্‌ছো?"

রাণী বল্‌লেন, "তুমি নবাবের সঙ্গে কি ক'রে পার্‌বে? আর নবাবও ত এসে পড়লো ব'লে, এর মধ্যেই বা কি ক'রে মেয়ের বিয়ে হবে।" এই ব'লে তিনি আরো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদ্‌তে লাগলেন।

রাজা বল্‌লেন, "শোন রাণী, মুসলমানের সঙ্গে কিছুতেই মেয়ের বিয়ে দেবো না। কাল সকালে উঠেই যার মুখ দেখবো প্রথমে, তারই সঙ্গে দেবো মেয়ের বিয়ে! এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

রাণী তখন কর্‌লেন কি, বাড়ীতে এক ছোক্‌রা চাকর ছিল ; তার নাম মদন—তাকে চুপি চুপি ডেকে সব কথা বল্‌লেন। মদন চাকর হ'লেও সে জাতে ছিল ব্রাহ্মণ এবং দেখতে শুনতেও বেশ ভাল ছিল। তাই কাল ভোরে উঠে আগে রাজাকে তামাক দেবার কথা তিনি ব'লে দিলেন।

এদিকে রাণী ভোরে উঠেই ঘরের দরজা খুলে দিলেন এবং রাজার নিদ্রাভঙ্গ হ'তেই মদন একেবারে তামাক এনে তাঁর সামনে হাজির হ'লো।

রাজা তখন কোথায় তার বাড়ীঘর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন এবং কার ছেলে, বাপ-মার পরিচয় কি—সব জেনে মনে মনে খুশী হ'লেন। তারপর মদনকে বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো।"

রাজার হুকুম অমান্য কর্‌বার মত ক্ষমতা মদনের ছিল না ; তাই সে নীরবে সম্মতি জানালে।

রাজকন্যার নাম রূপবতী। সে তখনো সোনার খাটে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল।

রাণী-মা গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর ঘুম ভাঙ্গালেন এবং তার হাত ধরে রাজার কাছে এনে একেবারে মদনের হাতে সঁপে দিলেন।

বিয়ের কোন উৎসব, কোন আয়োজন হ'লো না। পুরোহিত মন্ত্র পর্য্যন্ত পড়লো না। শুধু ধর্ম্মকে সাক্ষী ক'রে রাজা ও রাণী মদনের হাতে চুপি চুপি কন্যাকে সঁপে দিলেন। ভোরের

দিকে অন্ধকারে তখনো রাজপুরী আচ্ছন্ন। সবাই যে যার ঘরে নিদ্রামগ্ন! কেউ বিয়ের কথা জান্‌তে পার্‌লে না। রূপবতী



সমস্ত দিন ঘরে বসে বসে কাঁদ্‌ল। রাণী-মাও অনবরত চোখের জল গোপন কর্‌তে লাগলেন।

এদিকে সেইদিনই গভীর রাত্রে রাজা একজন মাঝিকে

ডেকে অনেক ধনরত্ন পুরস্কার দিলেন এবং তার নৌকোতে মেয়ে ও জামাইকে তুলে দিয়ে রাজ্য থেকে বিদায় কর্‌লেন।

মাঝি সারারাত ধরে নৌকো বাইতে লাগল। হাওয়ার জোর ছিল, তাই পাল তুলে দিলে। তীরবেগে ছুট্‌লো নৌকো।

বহু গ্রাম, বহু নদ-নদী ছাড়িয়ে ভোরের সময় নৌকো এসে লাগল এক নিবিড় অরণ্যের কাছে। তার চার পাশে কোথাও কোন গ্রামের চিহ্ন নেই। শুধু বন্য জন্তু-জানোয়ারের বাস সেখানে। এই অজানা অচেনা জায়গায় মাঝি তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

রাজকন্যা সেইখানে বসে বসে কাঁদ্‌তে লাগল। মদন অনেক বুঝিয়ে তাকে শান্ত কর্‌লে।

এদিকে ভোর হ'তে না হ'তেই দু'জন জেলে নদীতে মাছ ধর্‌তে এসে তাদের দেখতে পেলে। এমন লক্ষ্মী-প্রতিমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে সুদর্শন একটি যুবককে দেখে তারা অবাক হ'য়ে গেল। এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে কেমন ক'রে মানুষ এলো? এই কথা ভাবতে ভাবতে তারা একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল এবং তাদের পরিচয় জিগ্যেস কর্‌লে।

পরিচয় তারা কিছুই বল্‌লে না, শুধু তাদের কথা শুনে রাজকন্যা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, আমাদের কেউ নেই।

তখন জেলেদের মনে ভারী দুঃখ হ'লো। তারা দুই ভাই কিন্তু কারো কোন ছেলেপিলে ছিল না। তাই নিজেদের ডিঙ্গিতে

তাদের তুলে নিয়ে বাড়ীতে চলে গেল। জেলেদের বৌয়েরা আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলো। কি ক'রে যে তাদের খাওয়াবে পরাবে তা ভেবেই পায় না! সেখানে তারা তাদের নিজেদের ছেলেমেয়ের মত ক'রে আদর-যত্নে প্রতিপালন কর্তে লাগল। মদন আর রাজকন্যা তাদের বড়-বৌকে বলতো, বড়-মা আর ছোট-বৌকে বলতো, ছোট-মা।

এইভাবে কিছুকাল কাট্বার পর একদিন মদন রাজকন্যাকে বল্লে, "বহুদিন আমি নিজের দেশে যাইনি এবং বাপ-মাকে দেখিনি, একবার তাঁদের দেখে আসি। দিন পনেরোর মধ্যেই আবার ফিরে আস্বো!"

রাজকন্যা তাকে অনুমতি দিলে। মদন চলে গেল।

কিন্তু পনেরো দিনের স্থলে এক মাস এবং এক মাস থেকে ক্রমে ছু'মাস কেটে গেল। তখনো মদন ফিরে এলো না দেখে রাজকন্যার মনে ভয় হ'লো। সে রোজ পথের দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে বসে থাকে এবং জেলেদের বৌদের জিজ্ঞাসা করে, কেন তার এত দেরী হচ্ছে?

এমন সময় একদিন জেলেরা ভাত খেতে বসে গল্প কর্তে লাগল যে, রামপুরের রাজা রাজচন্দ্রের একমাত্র কন্যাকে কোন দস্যু রাজ্য থেকে চুরি ক'রে নিয়ে পালিয়েছে। যে তাকে ধরে দিতে পার্বে তাকে রাজা প্রচুর পুরস্কার দেবেন ব'লে ঘোষণা করেছেন।

এই কথা শুনেই রাজকন্যার বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো।